সাধ আহ্লাদ

প্রফুল্ল রায়

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

কল্যাণব্রত দাশগুপ্ত

সহৃদয়েষু

ট্যাক্সিটা থামতেই ফ্রন্ট সীট থেকে নেমে প্রথমে মীটার দেখল মন্মথ। সারচার্জ জুড়ে হিসেব করে ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিল। তারপর পেছন দিকের দরজাটা খুলে বলল, 'নামো, আমরা এসে গেছি।'

মন্মথর বয়স চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। টকটকে গায়ের রঙ, ছ-ফুটের মতো হাইট, চওড়া কাঁধ। লম্বাটে ভরাট মুখে মোটা ফ্রেমের চৌকো ফ্যাশনেবল চশমা। পরনে দামী ইজিপসিয়ান কটনের বেল-বটম আর হাওয়াই শার্ট। পায়ে ফোম-বসানো পুরু সোলের চপ্পল, হাতে স্টীলের ব্যান্ডে ওভাল শেপের জাপানী ঘড়ি। হঠাৎ দেখলে তাকে কোন বড় কোম্পানির একজিকিউটিভ মনে হয়। আসলে তার কাজ হলো নানা ধরনের মানুষকে আনন্দ দেবার জন্য মেয়ে যোগাড় করে পৌঁছে দেওয়া। এটাই তার প্রফেসান ; এর জন্য মোটা ফী পেয়ে থাকে সে।

পেছনের সীটে বসে ছিল দীপা। সে চমকে উঠল ; তারপর এলোমেলো পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে এলো। আর তখনই তার চোখে পড়ল সামনে অনেকটা জায়গা উঁচু কম্পাউন্ড ওয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়ালে নানা রঙের এবড়ো খেবড়ো পাথর বসিয়ে একটা চমৎকার প্যাটার্ন বানানো হয়েছে।

দু ধারে দেয়াল চলে গেছে। মাঝখানে বিরাট গেট। গেটের মাথায় নিওন সাইনে লেখা আছেঃ 'ব্লু মুন ক্লাব'। ক্লাবটার নাম দীপা আগেই মন্মথর কাছে শুনেছে। আজ ওখানেই তাদের যাবার কথা।

জায়গাটা কলকাতায় দারুণ 'পশ' এলাকায়। একশো ফুট চওড়া ঝকঝকে অ্যাসফাল্টের রাস্তার দু-ধারেই নতুন নতুন হাই-রাইজ বিল্ডিং।

সময়টা মে মাসের মাঝামাঝি। কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যে নেমেছে। রাস্তার দুই পাশে কর্পোরেশনের মার্কারি ল্যাম্পগুলো জ্বলে উঠেছে। দক্ষিণ দিক থেকে উল্টোপাল্টা আরামদায়ক হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল।

দীপা চারপাশের দৃশ্যাবলী কিছুই দেখছিল না। ট্যাক্সিতে ওঠার পর থেকেই তার বুকের ভেতরটা কাঁপতে শুরু করেছিল। এখন সেখানে ঝড়ের মতো কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে। অথচ মন্মথর সঙ্গে আগেও সে আরো অনেক জায়গায় গেছে। তখন এমন হয়নি।

কলকাতায় প্রায় রোজই গাদা গাদা ফরেন টুরিস্ট আসে। তাদের অনেকেই চায় সাইট-সীয়িং-এর সময় বা লাঞ্চের টেবলে এখানকার মেয়েরা সঙ্গ দিক। জাস্ট এ সফ্‌ট্‌ ফেমিনিন টাচ। এর জন্য তারা ভালো পয়সাও দেয়। সেই সঙ্গে একখানা দামী লাঞ্চও জোটে আর পাওয়া যায় স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে চমৎকার কিছু প্রেজেন্টেশন।

মন্মথ দীপাকে এ-রকম অনেক ফরেন টুরিস্ট যোগাড় করে দিয়েছে। এমনিতে টুরিস্টরা বেশির ভাগই ভদ্র, মার্জিত। তবে অনেকে আমুদে এবং হুল্লোড়বাজও হয়। কেউ কেউ বীয়ার আর হুইস্কিটা বেশি খেয়ে ফেললে আচমকা জড়িয়ে ধরে একটু আধটু আদরও করে বসে। কিন্তু ওটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। ওরা ভালো ভালো খাবার খাওয়াবে, পয়সা দেবে, প্রেজেন্টেশন দেবে আর ফুলদানির মতো দীপাকে কাছে বসিয়ে শুধু দেখে যাবে, সেটা তো আর সবসময় হয় না। কখনও কখনও একটু আধটু বাড়াবাড়ি করে ফেললে কী আর করা যাবে।

কিন্তু আজকের ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। খবরটা অবশ্য মন্মথই দিয়েছিল দীপাকে। তবে একবারও জোর করেনি। কখনও কোন ব্যাপারেই জোর খাটায় না মন্মথ। সে জানে, তার নীট ফল ভালো হয় না। নিজের বিবেক এবং প্রফেশানকে আগাগোড়া পরিষ্কার রাখতে চায় মন্মথ। দীপা যে আজ তার সঙ্গে এসেছে সেটা সম্পূর্ণ তার নিজের ইচ্ছায়, সব দিক ভেবে। না এসে দীপার উপায় ছিল না। কিন্তু এখন দারুণ এক ভয় তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছে।

ট্যাক্সিটা মীটার তুলে চলে গিয়েছিল। মন্মথ দীপাকে বলল, 'চলো—

ওরা 'ব্লু মুন ক্লাবে'র গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

দীপার বয়স বাইশ-তেইশ। বাঙালি মেয়েদের মতো মাঝারি

হাইট তার, পাঁচ ফুট চার কি পাঁচ। গায়ের রঙ এক কথায় চমৎকার ; আশ্বিনের রৌদ্রঝলকের মতো। পাতলা ফুরফুরে নাক সটান কপাল থেকে নেমে এসেছে। টিয়াঠুঁটি আমের মতো চিবুক, ছোট কপাল, গলাটা যেন সোনার ফুলদানি। তবে দীপার সব আকর্ষণ তার চোখে। চোখদুটো যে খুব বড় তা নয়, তবে ভাসা ভাসা এবং তাতে লম্বাটে টান রয়েছে। এমন মায়াবী চোখ ক্বচিৎ কখনো চোখে পড়ে। একজন আমেরিকান টুরিস্ট উচ্ছ্বাসের মাথায় তো বলেই ফেলেছিল, 'টিপিক্যাল ওরিয়েন্টাল আইজ।'

এই মুহূর্তে দীপাব পরনে ফুল ভয়েলের প্রিন্টেড শাড়ি, মেরুন রঙের ভয়েলের ব্লাউজ। পায়ে স্লিপার। বাইরে বেরুবার মতো এই এক সেট পোশাকই তার রয়েছে। গায়ে সোনার গয়না বলতে কিচ্ছু নেই। গলায় একটা বীডের মালা আর দু হাতে পলার রুলি—এতেই তাকে অলৌকিক দেখাচ্ছে।

গেটের কাছে সাদা ধবধবে উর্দিপরা একটা নেপালী দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল। মন্মথ জিজ্ঞেস কবল, 'উমাপতি সমাদ্দার সাব আয়া?'

দাবোয়ান ঠাণ্ডা মঙ্গোলিয়ান চোখে তাকিয়ে বলল, 'জী।' ক্লাব মেম্বারদের সবাইকেই সে চেনে। উমাপতি এই প্রাইভেট ক্লাবেব নতুন মেম্বাব।

বাইরে থেকে যাতে কিছু দেখা না যায় সেজন্য দশ গজ ভেতরে গেটের মাপের একটা ফেন্স খাড়া করা রয়েছে ; তার ওপর রঙিন নাইলনের ম্যাট ঝোলানো।

দারোয়ানকে পেছনে ফেলে নাইলনের ফেন্সের পাশ দিয়ে মন্মথ আর দীপা ভেতরে ঢুকে পড়ল। দীপার পা ঠিকমতো পড়ছিল না। হাঁটুব জোড় আলগা হয়ে গেলে যেমন হয় সেইভাবে সে হাঁটছিল। মন্মথ নীচু গলায় ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'বী স্টেডি।'

দীপা বলতে চাইল, 'আমি পারব না, পারব না—' কিন্তু গলার ভেতর থেকে স্বরটা বেরিয়ে এলো না।

ভেতরে একদিকে কার্পেটের মতো লন। সেখানে লাল-নীল গার্ডেন আমব্রেলার তলায় এক একটা বেতের টেবল ঘিরে চারটে করে গোল ফ্যাশানেবল বেতের চেয়ার সাজানো রয়েছে। প্রতিটি টেবলেই থোক থোক ভিড়। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক সুন্দর

স্বাস্থ্যবান সুখী পুরুষ এবং মহিলা। আর আছে মড যুবক-যুবতীরা। অদ্ভুত অদ্ভুত তাদের সাজ-পোশাক। মেয়েদের বেশির ভাগেরই পরনে হট প্যান্ট আর স্লিভলেস গেঞ্জি কিংবা ব্রা-টাইপের লুকথ্রু-ব্লাউজ। একটি মেয়ের পিঠে দেখা গেল লেখা আছে 'টাচ মী নট'।

লনের ডান পাশে নুড়ির রাস্তা। তারপর টাইলস-বসানো অনেকগুলো সিঁড়ির মাথায় সুইমিং পুল। পুলটা অবশ্য স্পষ্ট দেখা যায় না। সেটাকে আড়াল করে স্টীলের ফ্রেমে নাইলনের নেট ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফিলিগ্রির কাজের মধ্যে যেমন থাকে নাইলনের নেটটায় তেমনি অল্প অল্প ফাঁক ; আর তার ভেতর দিয়ে আবছাভাবে চোখে পড়ছে কস্টিউম-পরা মেয়েরা জলপরীর মতো পুলে সাঁতার কাটছে। পুলের ওপর উঁচু বাঁধানো জায়গায় অনেক-গুলো পুরুষ বীয়ারের মগ হাতে নিয়ে বসে ছিল। সাঁতারের দৃশ্য দেখতে দেখতে তারা মাঝে হুল্লোড় বাধিয়ে হেসে উঠছিল।

লন আর সুইমিং পুলের পর আরেকটা চওড়া নুড়ির রাস্তা। আর ওধারে তিনতলা ক্লাব বিল্ডিং। বাড়িটার সারা গায়ে মডার্ন আর্কিটেকচারের ছাপ।

গোটা ক্লাবটা জুড়ে এমনভাবে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে যা চোখকে এতটুকু কষ্ট দেয় না। আলোটা নরম আর আরামদায়ক। কোথায় যেন স্টিরিওতে খুব ধীরে ওয়েস্টার্ন মিউজিক বাজছে।

লনের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে গেল মন্মথ। তারপর দ্রুত এ ধার থেকে ও ধারে একবার তাকিয়েই কোণের দিকের একটা আমব্রেলার তলায় কাদের যেন দেখতে পেল। দীপাকে নিয়ে সটান সেখানে চলে গেল সে।

লন পেরিয়ে আসবার সময় দীপা লক্ষ্য করেছিল, ওখানে তিনজন বসে আছেন। সবাই বেশ বয়স্ক মানুষ। কেউ পঞ্চাশের নিচে হবেন না।

তিনজনের মধ্যে যাঁর দিকে সবার আগে চোখ যায় তিনি খুব একটা লম্বা না, মাঝারি মাপের বেঢপ চেহারা তাঁর। সারা গায়ে থলথলে মাংস। গোলমতো মুখে এবং গলায় চর্বির থাক। কান আর নাকের ভেতর থেকে গোছা গোছা লোম বেরিয়ে আছে।

মাথার মাঝ বরাবর সিঁথি ; তার দু ধারে কাঁচা-পাকা চুল চিরুনি দিয়ে পাট করে শোয়ানো রয়েছে। তবে পাশের দিকে অর্থাৎ কানের ওপর চুল নেই বললেই হয়, একেবারে চামড়া ঘেঁসে ছাঁটা। জোড়া ভুরু তাঁর, আংটির মতো পাকানো পাকানো ভুরুর লোম। মুখটা পেঁপের মতো। ওপর দিকটা সরু, নিচের দিক ভারী এবং ছড়ানো। 'লাইম লাইট' বলে একটা ইংরেজি ছবি দেখেছিল দীপা। সেখানে চার্লি চ্যাপলিনের নাকের তলায় চৌকোমতো যে গোঁফ ছিল অবিকল সেই গোঁফটি ভদ্রলোকটির ওপরের ঠোঁটে একই জায়গায় বসানো। বড় বড় ঘোলাটে চোখ, লালচে মুখ। দেখেই বোঝা যায় হাই ব্লাড প্রেসার।

তাঁর পোশাক দেখবার মতো। আগেকার দিনের কোমর থেকে পা পর্যন্ত এক মাপের এক বগ্‌গা ঢলঢলে ট্রাউজার আর ডবল কাফ দেওয়া ফুল শার্ট। বাচ্চাদের নিকার-বোকারের মতো পেটের দিক থেকে কাঁধের ওপর দিয়ে দুটো ফিতে পেছন দিকের কোমরে আটকে রাখা হয়েছে।

এঁর দু পাশে আর সে দুজন বসে ছিলেন তাঁদের একজন বেশ সুপুরুষ। তাঁর পোশাক-টোশাক একালের মডছেলে-ছোকরাদের মতো। নিখুঁত কামানো মুখ, চওড়া জুলপি, ঝাঁকড়ানো চুল। দ্বিতীয় লোকটির চেহারা কোলকুঁজো মার্কা। গোল চোখ, ভাঙা গাল, কোদালের মতো খাড়া চোয়াল। পরনে ধুতি আর মোটা টুইলের পাঞ্জাবি।

চার্লির মতো যাঁর গোঁফ তাঁর সামনে বীয়ারের মগ রয়েছে, বাকি দু-জনের সামনে দুটো হুইস্কির গেলাস।

গোঁফওলা থলথলে লোকটি মন্মথ আর দীপাকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর মুখে কিসের একটা ছায়া পড়ল যেন। তারপর নড়ে-চড়ে বসে কাঁপা হাতে পকেট থেকে রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের গোল বাইফোকাল চশমা বার করে নাকের ওপর ঝুলিয়ে দিলেন। আজকাল এ রকম ফ্রেম অবশ্য অচল। যাই হোক ভদ্রলোকটি বললেন, তোমরা তা হলে এসে গেছ!' তাঁর স্বর ঈষৎ জড়ানো ; খুব সম্ভব এর কারণ বীয়ার। তাঁর বলার ভঙ্গি এবং চোখ-মুখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল মন্মথরা না এলেই তিনি খুশী হতেন।

মন্মথ বলল, 'পাংচুয়ালিটি হল বিজনেসের ফার্স্ট কণ্ডিসান। সাড়ে সাতটায় আসব বলেছিলাম, এই দেখুন—' বাঁ হাতের কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল, 'এখনও তিন মিনিট বাকি আছে।'

'আরে বাপু, আধ ঘণ্টা পরে এলেও কেউ তোমার গর্দান নিত না। সাড়ে আটটা পর্যন্ত পাঁজীতে টাইম আছে। তার মধ্যে এলেই হতো। নাও, এখন বোসো—'

এক একটা টেবল ঘিরে চারটে করে চেয়ার ওঁরা তিনজন তিনটে দখল করে বসে আছেন। খালি রয়েছে একটা, আরো একটা দরকার। চার্লিমার্কা গোঁফের পাশ থেকে মড ছোকরাদের মতো পোশাক পরা লোকটি জড়ানো ভারী গলায় চেঁচিয়ে বললেন, 'বেয়ারা কুর্সি লাও—'

তক্ষুনি আরেকটা চেয়ার এসে গেল। মন্মথ বসতে বসতে পাশের ফাঁকা চেয়ারটা দেখিয়ে দীপাকে বলল, 'বোসো—'

নিজেকে যতটা সম্ভব গুটিয়ে জড়সড় হয়ে বসল দীপা। আর মুখ নিচের দিকে। চোখ না তুলেও সে টের পাচ্ছিল চার্লিমার্কা গোঁফের পাশের লোকদুটি তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে গিলছেন যেন; তাঁদের চোখে পাতা পড়ছে না।

মন্মথ চার্লিগোঁফকে বলল, 'নাউ টু বিজনেস। কাজের কথা শেষ করে ফেলি।' দীপাকে দেখিয়ে বলল, 'এর ফোটো আপনাকে দিয়ে গিয়েছিলাম। দেখে মিলিয়ে নিন।'

চার্লিগোঁফ বললেন, 'ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এসেছ নাকি? ও সব পরে হবে। আগে কী খাবে বল?'

'আমি ক্লায়েন্টের পয়সায় কিছু খাই না। ফী-টা পেলেই খুশী। আপনি অ্যাডভান্স ফী চুকিয়ে দিয়েছেন; আই অ্যাম হ্যাপি। এখন মিলিয়ে দেখুন। আমাকে আটটার ভেতর আবার আরেক জায়গায় যেতে হবে।'

'মেলাবার দরকার নেই। মনে হচ্ছে ঠিকই আছে।'

'তা হয় না মিস্টার সমাদ্দার। এখন বীয়ারের ঘোরে বলছেন। পরে বলবেন একজনের ফোটো দেখিয়ে আরেকজনকে গছিয়ে গেছি। আমার গুড-উইলের পক্ষে সেটা ক্ষতিকর।'

'তুমি জ্বালালে !' চার্লিমার্কা গোঁফ অগত্যা বুক পকেট হাতড়ে একটা ফোটো বার করলেন। দীপার ফোটো। একবার ফোটোটা দেখলেন তিনি, তারপর বিব্রতভাবে দীপাকে বললেন, ঠিক আছে।'

মন্মথ বলল, 'ওটা আমাকে ফেরত দিন।' ফোটোটা নিতে নিতে বলল, 'এবার আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। এর নাম দীপা।' দীপাকে বলল, 'আর উনি উমাপতি সমাদ্দার, আগেই ওঁর সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে। এখন থেকে স্ট্রেট তোমরা তোমাদের ব্যাপারটা ডিল করবে।'

বাকি দুজনের সঙ্গেও দীপার পরিচয় করিয়ে দিল মন্মথ। টুইলের পাঞ্জাবি-পরা লোকটির নাম ভূপতি সামন্ত আর ছোকরাদের মতো পোশাক যাঁর তিনি পরমেশ সেন। ওঁরা উমাপতি সমাদ্দারের বন্ধু। মন্মথ আরো জানালো পরমেশ সেনের সঙ্গে তার অনেক-দিনের জানাশোনা। তিনিই উমাপতির সঙ্গে দীপার ব্যাপারে তার যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন।

দীপা এখনও মুখ তুলতে পারল না। হাত-পা, সব কেমন যেন আলগা হয়ে গিয়েছিল তার। কোনরকমে শিথিল হাত দুটো একসঙ্গে জোড়া করে বুক পর্যন্ত তুলল।

মন্মথ বলল, 'তাহলে মিস্টার সমাদ্দার, আমার কাজ শেষ হলো। এবার চলি।'

উমাপতি বললেন, 'যাবে! আচ্ছা। তা হলে আর আটকাবো না—'

মন্মথ এবার দীপার দিকে ফিরল। এক পলক তাকে লক্ষ্য করে কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'টেক ইট ইজি।'

দীপা খুব আবছা গলায় বলল, 'আমার ভীষণ ভয় করছে।'

'কিসের ভয়। একজিসটেন্সের জন্য মানুষকে অনেক কিছু করতে হয়। ওয়ার্ল্ড অন্যরকম হয়ে গেছে।'

পাকা সেলসম্যানের মতো কাজটি সেরে এবং অভিজ্ঞ দার্শনিকের মতো কথা বলে একটু পবে মন্মথ চলে গেল।

দীপা মুখ নীচু করেই বসে আছে। গলায় খাকারি দিয়ে উমাপতি বললেন, মন্মথ তোমাকে সব কথা বলেছে তো?

সব কথা যে কী, দীপা জানে। সে আস্তে মাথা নাড়ল।

'সপ্তাহে ছদিন আমার কাছে থাকতে হবে। একদিন ছুটি। সেদিন তুমি ফ্রী। ইচ্ছা করলে বাড়ি যেতে পারো।'

দীপা এবারও মুখে কিছু বলল না; আগের মতো মাথাটা হেলিয়ে দিল।

উমাপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়ি কোথায় তোমার?'

অস্পষ্ট গলায় দীপা বলল, 'সোদপুরে।'

'কে কে আছে?'

'মা, দুই বোন আর এক ভাই—'

'বাবা নেই?'

'না।'

চুকচুক করে জিভের ডগায় শব্দ করলেন উমাপতি, 'আহা।' তাঁর সহানুভূতিটা আন্তরিক মনে হলো।

একটু পর উমাপতি আবার বললেন, 'ভাইবোনদের মধ্যে তোমার বড় কেউ আছে?'

দীপা বলল, 'না, আমিই সবার বড়।'

আবার উমাপতির জিভের ডগায় চুকচুক শব্দ হলো। তিনি বললেন, হোল ফ্যামিলি তোমাকেই চালাতে হয় নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'খুবই বিপদের কথা।'

উমাপতির বাঁ পাশে বসে পরমেশ সেন, অনেকক্ষণ উসখুস করছিলেন। এ জাতীয় কথাবার্তা তাঁর মনঃপূত হচ্ছিল না। বন্ধুকে বললেন, 'এসব কী বলছ উমাপতি। রট—'

উমাপতি বললেন, 'না, মানে মেয়েটার সঙ্গে আলাপ হলো। এখন থেকে আমার কাছে থাকবে। একটু খোঁজখবর নিচ্ছি। জানতে ইচ্ছা হয় কিনা তুমিই বল।'

পরমেশ উত্তর দিলেন না। হুইস্কির গেলাস তুলে নিয়ে ছোট ছোট 'সিপে' খেতে লাগলেন।

উমাপতি এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কত বয়স হলো?

'তেইশ।'

'মোটে! আমার বড় মেয়েরই তো চব্বিশ চলছে। তিন বছর আগে তার বিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে দুটি নাতি-নাতিনী—'

উমাপতিব কথা শেষ হবার আগেই বিরক্ত গলায় পরমেশ ধমকে উঠলেন, 'তোমার কোনরকম কমনসেন্স নেই। কার সঙ্গে কখন কী বলতে হয়, কিছুই জান না।'

বোঝা যাচ্ছিল উমাপতিব কন্ট্রোল বুমটা পুরোপুরি পরমেশের হাতে। পরমেশ তাকে যেভাবে চালান তিনি সে-ভাবে নড়াচড়া করেন। উমাপতি কিছুটা কুঁকড়ে গিয়ে বললেন, 'তা বটে, তা বটে—' পরক্ষণেই হঠাৎ কী মনে পড়তে তাড়াতাড়ি শার্টের ডবল-কাফ দেওয়া হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সর্বনাশ! আটটা দশ। সাড়ে আটটার ভেতর দীপাকে নিয়ে সাদার্ন অ্যাভেনিউতে পেঁছিতে হবে।'

পরমেশ বললেন, 'তাড়াহুড়োব কী আছে। সাড়ে আটটার জায়গায় না হয় ন'টা সাড়ে ন'টা হবে।'

'বলো কী!' উমাপতির চোখমুখ দেখে মনে হলো বন্ধুর কথায় তিনি বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। পরমেশের দিকে ফিরে বাইফোকাল লেন্সের তলা দিয়ে তাঁকে দেখতে দেখতে বলতে লাগলেন, 'তুমি তো জানো পাঁজী ছাড়া একটা পা-ও ফেলি না। মেয়েটা এল ; দিনক্ষণ না দেখে তাকে কখনও নতুন জায়গায় তোলা যায়! বাড়ি থেকে বেরুবার আগে দেখে এসেছি সাড়ে আটটা পর্যন্ত সময়টা ভালো ; তারপর চাঁদ অশ্লেষা নক্ষত্রে ঢুকবে। তখন কোন কাজ হয়?'

পরমেশ গলার ভেতর থেকে বিবক্ত একটা শব্দ করলেন।

উমাপতির আর এক বন্ধু ভূপতি একটি কথাও বলছিলেন না। নিচে লনের ঘাসের দিকে তাকিয়ে থাকলেও দীপা দেখতে পাচ্ছিল, ভূপতি অনবরত বেয়ারাদের অর্ডার দিয়ে নানারকম দামী দামী খাবার আনিয়ে গোগ্রাসে খেয়ে যাচ্ছিলেন আব মাঝে মাঝে লোভী বেড়ালের মতো তার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

উমাপতি ব্যস্তভাবে একটা বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'ট্যাক্সি লাও তিন মিনিটকা অন্দর—'

বেয়ারাটা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গেল!

উমাপতি এবার বন্ধুদের বললেন, 'তোমরা আমাদের সঙ্গে যাবে না ক্লাবেই থাকবে?'

কোনটা বেশী লোভনীয় এবং লাভজনক, মনে মনে তার অঙ্ক কষে পরমেশ বললেন, 'সবে তো ড্রিঙ্ক সেসান বসালাম। রাতও এমন কিছু হয়নি। আমি ভাই এখন যাচ্ছি না।' ভূপতির দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি কী করবেন?'

ভূপতি ঘাড় কাত করে জানালেন, তাঁরও এখন ক্লাব ছেড়ে নড়বার ইচ্ছা নেই।

উমাপতি বললেন, 'তা হলে তোমরা থাকো।'

পরমেশ বললেন, 'তুমি ভাই যাবার সময় ম্যানেজারকে বলে দিও আমাদের যেন ড্রিংক ট্রিংক সার্ভ করে।'

'নিশ্চয়ই।'

তিন মিনিটের আগেই সেই বেয়ারাটা ফিরে এসে জানালো ট্যাক্সি এসে গেছে; গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

উমাপতি দীপার দিকে ফিরে বললেন, 'চলো—' তারপর তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে কোমরের কাছটায় হাত দিয়ে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। যন্ত্রণায় তাঁর সারা মুখ কুঁচকে নীল হয়ে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ পর তাঁর গলার ভেতর থেকে কাতর শব্দ বেরিয়ে এল, 'উহু-হু—'

পরমেশ বললেন, 'কী হল উমাপতি?'

কোমরটা ডলে ডলে একটু সামলে নিয়ে উমাপতি বললেন, 'বাতের সেই ব্যথাটা। পূর্ণিমা পড়েছে না? তার ওপর এতক্ষণ চেয়ারে জাম হয়ে বসেছিলাম। উঠতে গিয়ে খচ করে লেগে গেল।'

'একটু বসে যাও।'

'না ভাই, বসবার সময় নেই। সাড়ে আটটার পর চাঁদ অশ্লেষা নক্ষত্রে গেলে আজ আর কোন কাজ হবে না। দীপাকে সোদপুরে ফিরে যেতে হবে।'

'তা হলে আর কি, বেরিয়ে পড়।'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে দীপাকে নিয়ে লন পেরিয়ে প্রথমে উমাপতি এলেন ক্লাব ম্যানেজার মিস্টার রেখীর ঘরে। ম্যানেজারের ঘরটা সুইমিং পুলের গা ঘেঁষে। রেখীকে বন্ধুদের ড্রিংক সার্ভ করার কথা বলে একটু পর দুজনে বাইরের রাস্তায় গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলেন। তারপর দ্রুত আরেকবার হাত-ঘড়িটা একবার দেখে নিলেন

উমাপতি। আটটা সতের। ড্রাইভারকে বললেন, 'সাদার্ন অ্যাভেনিউ চালিয়ে।' দশ মিনিটকা অন্দর যানা পড়ে গা। বহোত জরুরী—'

ড্রাইভার বলল 'জী—' তারপর স্টার্ট দিয়ে গাড়িটাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল।

দুই

চাকার তলায় অ্যাসফাল্টের মসৃণ রাস্তা কালো ফিতের মতো গুটিয়ে যাচ্ছিল। দু ধারের বাড়ি, শো উইন্ডো, দোকান—সব কিছুই চোখের পলক পড়তে না পড়তেই সট সট সরে যাচ্ছে।

ব্যাক সীটের এক জানালার কাছে বসেছিলেন উমাপতি। আরেক জানালা ঘেঁসে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে দীপা। মাঝখানে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা।

এতক্ষণ তবু একরকম কেটেছে কিন্তু এখন প্রতি সেকেন্ডে ভয়ে দীপার গায়ে নতুন করে কাঁটা দিচ্ছিল। জিরো আওয়ার বলে একটা কথা সে শুনেছে, সেই সময়টা দ্রুত ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে। এখন সে কী করবে? গাড়িটা থামিয়ে নেমে যাবে? কিন্তু তারও উপায় নেই। মন্মথর হাত দিয়ে উমাপতি অনেক টাকা অ্যাডভান্স করেছেন। আর সেই টাকা দীপা নিয়েও ফেলেছে। এখন ফেরার রাস্তা নেই। দীপার মনে হচ্ছিল কেউ পেরেক ঠুকে ট্যাক্সির গায়ে তাকে আটকে দিয়েছে।

উমাপতি আস্তে করে ডাকলেন, 'দীপা—'

ট্যাক্সির ভেতর আবছা অন্ধকার। ভয়ে ভয়ে জানালার দিক থেকে মুখ ফেরাল দীপা।

উমাপতি বলতে লাগলেন, 'তখন ভালো করে তোমার খবর নিতে পারছিলাম না। পরমেশটা খালি বাগড়া দিচ্ছিল। কদ্দুর পড়াশোনা করেছ?'

দীপা শিথিল গলায় বলল, 'বি.-এ পার্ট ওয়ান পর্যন্ত। পরীক্ষা দিতে পারিনি। তার আগেই বাবা মারা গেল।'

উমাপতি চমকে উঠলেন যেন, 'আরে সর্বনাশ! তুমি তো

আমার চাইতে ঢের বিদ্বান দেখছি। আমি কেঁতিয়ে-কুঁতিয়ে কোন রকমে থার্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিলাম। মন্মথ এ কাকে আমার কাছে নিয়ে এল। আমি যে বাপু হীনম্মন্যতায় ভুগব এবার থেকে। কোন মানে হয়!'

ভদ্রলোক রগড় করছেন কিনা, দীপা বুঝতে পারল না। সে চুপ করে থাকল।

উমাপতি আবার বললেন, 'তুমি এই যে এলে, একটানা ছদিন আর বাড়িতে ফিরতে পাববে না—বাড়িতে বলে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কী জন্যে এসেছ, বাড়িতে জানে?'

'না।'

'কী বলেছ তা হলে?'

দীপা যা জানালো সংক্ষেপে এই রকম। সে বাড়িতে বলেছে, একটা সেলসগার্লের চাকরি নিয়ে তাকে কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে। সপ্তাহে ছদিন করে বাইরে থাকতে হবে। শুধু একদিনের জন্য বাড়ি আসতে পারবে।

উমাপতির কৌতূহল বাড়ছিল। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মা কী বললে?'

'কিছু বলেনি।'

একটু ভেবে উমাপতি বললেন, 'মায়ের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলতে হলো?'

দীপা উত্তর দিল না।

উমাপতি দুঃখিতভাবে মাথা নাড়লেন, 'ভেরি স্যাড।'

লোকটা সত্যিকারের সহানুভূতিওলা হৃদয়বান মানুষ না একজন ধুরন্ধর অভিনেতা, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে একটা ব্যাপার দীপা লক্ষ্য করেছে, ট্যাক্সিতে যেতে যেতে উমাপতি একবারও তার গায়ে হাত দেন নি। ইচ্ছা করলেই দিতে পারেন। এই শরীরের সর্বসত্ত্ব এখন তাঁর। দীপা কিছু বলল না।

কিছুক্ষণ পর আচমকা কী মনে পড়তে উমাপতি বলে উঠলেন, 'একটা ব্যাপার একেবারেই ভুলে গেছি।'

'কী?' আস্তে করে জিজ্ঞেস করল দীপা।

'ক্লাবে তোমাকে কিছুই খাওয়ানো হয়নি। আমার একেবারেই খেয়াল ছিল না। কিছু মনে কোরো না।'

দীপা চুপ করে রইল।

উমাপতি আবার বললেন, 'ঠিক আছে, সাদার্ন অ্যাভিনিউতে চল। ওখানে সব ব্যবস্থা আছে।'

দীপা এবারও কোন কথা বলল না।

উমাপতি একটু পরে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। বললেন, 'তোমার সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু জানলাম। আমার সম্পর্কে তুমি কতটা জানো? মন্মথ তোমাকে কিছু বলেছে?

দীপা বলল, 'তেমন কিছু না।'

'তোমার জানা দরকার। মন্মথর আগেই সব বলে নেওয়া উচিত ছিল। আমার কাছে থাকবে, অথচ আমি লোকটা কেমন, সে সম্বন্ধে ক্লিয়ার আইডিয়া না থাকাটা ঠিক না।'

দীপা উত্তর দিল না।

উমাপতি বলতে লাগলেন, 'ট্যাক্সিতে বসে কথা বলার সময় নেই। আমরা প্রায় এসেই গেছি। সাদার্ন অ্যাভিনিউর ফ্ল্যাটে গিয়ে আমার কথা শোনাবো।'

দীপা এবারও চুপ।

আর দু-এক মিনিট পর ট্যাক্সিটা সাদার্ন অ্যাভেনিউর বিশাল এক হাইরাইজ বিল্ডিং-এর সামনে আসতেই ব্যস্তভাবে উমাপতি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অ্যাই রোখকে, রোখকে—'

তিন

ট্যাক্সিভাড়া চুকিয়ে কোমরে একটা হাত রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দীপাকে নিয়ে বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটার লিফ্‌ট বক্সে এসে ঢুকলেন উমাপতি। তারপর তেরো নম্বর বোতামটা টিপে দিলেন।

ঝিঁঝির ডাকের মতো একটানা শব্দ করে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে লিফ্‌টটা থারটীনথ ফ্লোরে পেঁছে গেল।

লিফ্‌ট বক্সের বাইরে বেরিয়ে দীপা দেখতে পেল সামনের দিকে

চওড়া করিডর চলে গেছে। তার দু ধারে দুটো করে চারটে ফ্ল্যাট। বাঁ দিকের দুই ফ্ল্যাটের মাঝখান দিয়ে ওপরে এবং নিচে যাবার সিঁড়ি।

ডানদিকের শেষ ফ্ল্যাটটার কাছে এসে উমাপতি পকেট থেকে চাবি বার করে কী-হোলে পুরে দিলেন। ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। উমাপতি বললেন, 'একটু দাঁড়াও। আমি ভেতরে গিয়ে আগে আলো জ্বালি। তুমি নতুন এসেছ, অন্ধকারে হোঁচট খাবে।'

উমাপতি ভেতরে ঢুকে একের পর এক সুইচ টিপে সব আলো জ্বেলে ফেললেন। তারপর দরজার কাছে এসে জামার হাতা তুলে দেখলেন, ঘড়িতে আটটা বেজে ঊনত্রিশ। দারুণ খুশি মুখে বললেন, 'চাঁদ অশ্লেষা নক্ষত্রে যাবার আগেই তোমাকে নিয়ে পোঁছুতে পেরেছি। এসো—'

দীপার বুকের ভেতর হৃৎপিন্ডটা ঢেউয়ের মতো দুলছিল। চোখের সামনে এত অজস্র আলো, কিন্তু কিছুই যেন স্পষ্ট নয়। দু ফুট দূরে দরজার ওপব দাঁড়িয়ে আছেন উমাপতি। তাঁর মুখ-চোখ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না; একটা ঝাপসা সিলুয়েট ছবির মতো মনে হচ্ছে। প্রায় অন্ধের মতো দীপা ভেতরে ঢুকল। তার মাথা এবং পা এত টলছে, আর এক সেকেণ্ডও বোধ হয় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

উমাপতি বললেন, 'চলো, আগে তোমাকে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাই।'

কোমরে হাত দিয়ে শরীর বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন উমাপতি। ছুঁচের গায়ে সুতোর মতো একট ঘোরের মধ্যে তাঁর পেছন পেছন হাঁটতে লাগল দীপা।

গোটা ফ্ল্যাটটায় তিনটে বড় বড় বেড রুম, একটা কিচেন, একটা স্টোর, দুটো বাথরুম, একটা ডাইনিং-কাম-ড্রইং রুম। বাথরুমে শাওয়ার আছে, বাথ টাব আছে, দুধের মতো ধবধবে বেসিন রয়েছে। বেডরুম, বাথরুম, কিচেন, ডাইনিং স্পেস—যাবতীয় কিছু দামী টাইলসে মোড়া। প্রতিটি ঘর ফার্নিশড। গদিমোড়া ফ্যাশনেবল খাট, ওয়ার্ডরোব, টেলিফোন, টি. ভি, ফ্রিজ, সোফা, ডিভান—যেখানে যেটি রাখলে সুন্দর দেখায় সেইভাবে রাখা

আছে। মাথার ওপর ঝকঝকে নতুন ফ্যান। ইলেকট্রিক ওয়্যারিং বাইরে থেকে দেখা যায় না, ডিসটেম্পার করা দেয়ালের ভেতর সেগুলো গোপন রয়েছে।

অন্ধের মতো ঘুরতে ঘুরতেও আরেকটা ব্যাপার দীপার চোখে পড়ল। আগে থেকেই গ্যাসের উনুন, স্টেনলেস স্টীলের নতুন বাসন-কোসন, দামী দামী ক্রকারি, চাল-ডাল-মাখন-ডিম-চা-চিনি-মশলা ফ্রিজে নানারকম ফল, মাছ, মাংস, সন্দেশ ইত্যাদি মজুত করে রাখা হয়েছে।

সবগুলো ঘর দেখাবার পর দীপাকে রাস্তার দিকের বিরাট ব্যালকনিতে নিয়ে গেলেন উমাপতি। মাটি থেকে প্রায় দেড় শো ফুট উচ্চতায় দাঁড়িয়ে নিচে সাদার্ন অ্যাভেনিউকে একটা কালো ফিতের মতো লাগছে। রাস্তার দু ধারে উজ্জ্বল মার্কারি ল্যাম্প-গুলো জ্বলছে। প্রাইভেট কার আর ডাবল্ ডেকার বাসগুলো স্রোতের মতো ছুটে যাচ্ছিল।

রাস্তার ওপারে যতদূর চোখ যায় একেবারে ফাঁকা। তবে ডাইনে এবং বাঁয়ে অনেকগুলো হাই রাইজ বিল্ডিং আকাশের দিকে মাথা তুলে রয়েছে। কলকাতার মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এর একটা নতুন কমপ্লেক্স এই সাদার্ন অ্যাভেনিউকে ঘিরে গড়ে উঠছে।

রাস্তার ওপার থেকে পঞ্চাশ মাইল স্পীডে হু-হু করে বাতাস ছুটে আসছিল। মনে হচ্ছিল উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

সামনের দিকে কম্পাসের কাঁটার মতো আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উমাপতি বলতে লাগলেন, 'ঐ দিকটায় লেক, ওখানে স্টেডিয়াম, ওখানে রোয়িং ক্লাব—' ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটামুটি চার পাশ চিনিয়ে দেবার পর বললেন, 'আমার মতে এটাই কলকাতার বেস্ট লোকালিটি। চলো, এবার ভেতরে যাওয়া যাক।'

ড্রইংরুমে এসে উমাপতি একটা সোফায় বসলেন, দীপাকে তাঁর মুখোমুখি আরেকটা সোফায় বসতে বললেন। কোমরের কাছে হাতটা চাপানোই রয়েছে। বাতের যন্ত্রণাটা বোধ হয় এখনও কমে নি।

উমাপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'ফ্ল্যাটটা কেমন দেখলে ?'

ঝাপসা গলায় দীপা বলল, 'ভালো।'

'তোমার জন্যে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট আগে থেকেই করে রেখেছি। শুধু একটা মুশকিল হয়েছে, যে মেইড সারভেন্টটার এখানে থাকার কথা সে আজ আসতে পারল না। তবে ঠিকানা রেখে দিয়েছে, কাল সকালেই এসে পড়বে।'

দীপা উত্তর দিল না।

উমাপতি এবার কাঁচুমাচু মুখে বললেন, আজ রাত্তিরে তোমার একটু অসুবিধে হবে। চাল-ডাল-মাছ-মাংস, সবই রয়েছে। কষ্ট কবে নিজের হাতে কিছু করে নিও।'

দীপা এবারও চুপ করে থাকল।

উমাপতি কী ভেবে এবার বললেন, 'এই ফ্ল্যাটটার এরীয়া হচ্ছে চোদ্দ শো স্কোয়ার ফুট। দাম পড়েছে এক লাখ পঁচিশ হাজার। ফার্নিচার, টি. ভি, ফ্রিজ'ট্রিজ কিনতে আরো পঁচিশ হাজার। টোটাল খরচ হয়েছে দেড় লাখ টাকা।'

দীপা কী বলবে, ভেবে পেল না। সে চুপ করে থাকল।

উমাপতি এবার বললেন, 'এতগুলো করকরে টাকা ব্যাঙ্ক থেকে কেন বার করে দিয়েছি জানো?'

কোন ব্যাপারেই এই মুহূর্তে দীপার কৌতূহল নেই। তবু নিজের অজান্তেই তার গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো, 'কেন?'

উমাপতি বললেন, 'স্রেফ একটু আনন্দের জন্যে। কিছু বুঝতে পারলে?'

দীপা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল—পারেনি।

উমাপতি বললেন, 'তা হলে আমার লাইফের কথা তোমাকে বলতে হয়।' একটু থেমে বললেন, 'যদি কিছু মনে না করো, একটা কাজ করতে পারবে?'

দীপা আধফোটা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী কাজ?'

'একটু যদি চা করতে খুব ভালো হতো। চা-টা আমি একটু বেশিই খাই।'

'করে আনছি।' দীপা উঠে পড়ল।

উমাপতি বললেন, 'চিনি দিও না কিন্তু। আমার ব্লাড সুগার হাই, ট হানড্রেড এইট্টি। চিনি খাওয়া বারণ।'

পাঁচ মিনিট পর দীপা কিচেন থেকে এক কাপ চা করে এনে উমাপতির সামনে সেন্টার টেবলের ওপর রাখলো।

এক কাপ চা-ই করেছিল দীপা। উমাপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার?'

'আমি খাবো না।'

এ ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করলেন না উমাপতি। হয়তো ভাবলেন রাত্তিরে চা খাওয়ার অভ্যাস নেই দীপার। কাপটা তুলে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, 'তোমাকে বলেছিলাম নিজের কথা শোনাবো। পরে ভেবে দেখলাম, এসেই গেছ, আমার কথা আজ হোক কাল হোক জানতেই পারবে। তা হলে শুধু শুধু বলে আর মুখে ফেনা তোলা কেন?' একটু থেমে কী মনে পড়তে আবার বললেন, 'এখন ক'টা বাজে বলো দেখি'—দীপার উত্তরের অপেক্ষা না করে জামার হাতা সরিয়ে প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন, 'সর্বনাশ।'

দীপা ভীষণ ভয় পেয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

'সাড়ে ন'টা বাজে।'

সাড়ে ন'টা বাজার জন্যে কী সর্বনাশ ঘটতে পারে দীপা বুঝতে পারল না। বিমূঢ়ের মতো সে তাকিয়ে থাকল।

'অনেক রাত হয়ে গেছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমার খুব খিদে পেয়েছে। রান্না চাপিয়ে দাও।'

সেই দুপুরবেলা চাট্টি ডাল-ভাত খেয়ে বেরিয়ে এসেছিল দীপা। তারপর থেকে এক ফোঁটা জলও পেটে পড়েনি। নিয়ম অনুযায়ী এতক্ষণে খিদে পেয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু পরপর এমন সব ঘটনা ঘটে গেছে, খিদের কথাটা একবারও মনে পড়েনি। আস্তে করে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী রাঁধব?'

'কী রাঁধব মানে। যা খাবে তা-ই রাঁধবে।'

'আপনি?' এই পর্যন্ত বলে চুপ করে গেল দীপা।

উমাপতি এক পলক তার দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন। বললেন, 'তুমি ভেবেছ আমি এখানে খাব। পাগল হয়েছ। আমার হাই প্রেসার আর হাই সুগার। রাত্তিরে দুখানা আলুনি রুটি আর এক বাটি তরকারি সেদ্ধ ছাড়া আর কিছু খাওয়ার উপায় নেই। আর সেটি খেতে হবে স্ত্রীর সামনে বসে।

ওর এদিক ওদিক হলে আর প্রাণে বাঁচতে হবে না।' বলতে বলতে সোফার হাতায় ভর দিয়ে কোনরকমে শরীরটাকে টেনে তুললেন।

দীপা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

উমাপতি আবার বললেন, 'সাড়ে ন'টার পর বাইরে থাকার উপায় নেই। এখানেই সাড়ে ন'টা বেজে গেল। যেতে যেতে দশটা। তাব মানে আজ কপালে ল্যাঠা আছে। আমি এখন যাই। চলো, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসবে।'

এরকম মানুষ আগে আর কখনও দ্যাখেনি দীপা। কিছুক্ষণ আগের ভয়টা নিজেব অজান্তেই কেটে যেতে শুরু করেছিল। সেই জায়গায় এখন অগাধ বিস্ময় দীপাকে যেন চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে।

উমাপতি আর দাঁড়ালেন না। কোমরে হাত রেখে শরীরটা কাত করে করে বাইবের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। বলতে লাগলেন, 'রাত্তিরে খাওয়ার পব ইনসুলিন নিতে হবে। তার ওপর বাতের ব্যথা নিয়ে ফিবছি, হট ওয়াটার ব্যাগ কোমরে চেপে না ধরলে হোল নাইট আর ঘুমোতে হবে না।'

দীপা কী বলবে, ভেবে পেল না।

যেতে যেতে হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন উমাপতি। পকেট থেকে খুবই ব্যস্তভাবে বড় চৌকো মতো সিলভারের একটা কৌটা বার করে খুলে ফেললেন। ভেতরটা পানের খিলি, সুপুরি, এলাচদানা আর লবঙ্গে বোঝাই। একসঙ্গে পাঁচ ছ'টা পানেব খিলি, আর এক মুঠো এলাচ-লবঙ্গ মুখে পুরে খচর-মচর কবে চিবিয়ে উমাপতি বড় করে হাঁ করলেন। তারপর মুখটা দীপার কাছে এনে বললেন, 'শুঁকে দেখ তো—'

দীপা হকচকিয়ে গেল!

উমাপতি বললেন, 'কী হল, শোঁকো।' বলে আবার হাঁ করলেন।

দীপা নাকটা মুখেব কাছে এনে শ্বাস টানল।

উমাপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের গন্ধ পেলে?'

'পানের।'

'আর ?'

'এলাচ লবঙ্গের।'

'আর ?'

'আর কিছু না।'

'ঠিক করে ভেবে বল। আরেকবার শুঁকবে ?' বলে আবার হাঁ করলেন। দীপা আবার উমাপতির মুখের কাছে নাকটা এনে শ্বাস টানল। তারপব বলল, 'আর কোন গন্ধ পাচ্ছি না।'

'তুমি বীয়ারের গন্ধ চেনো ?' উমাপতি জিজ্ঞেস করলেন।

লাঞ্চেব টেবলে ফবেন টুরিস্টদের সঙ্গ দেবার সময় দীপা তাদের বীয়ার বা হুইস্কি খেতে দেখেছে। ঐ গন্ধ দুটো তার চেনা। মুখ নীচু করে সে বলল, 'চিনি।'

'আমাব মুখে তেমন কোন গন্ধ নেই ?'

'না।'

'বাঁচালে। মুখে বীয়ারের গন্ধ নিয়ে বাড়ি ঢুকলে কী ঝামেলা হবে, ভাবতে পারি না। ঐ হারামজাদা দুটো—পরমেশ আর ভূপতি—ক্লাবের মেম্বার করে বীয়ার টীয়ার ধরিয়ে আমার বারোটা বাজিয়ে দিলে।' বলতে বলতে আবাব দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

দীপা তাঁব সঙ্গে সঙ্গে চলল।

উমাপতি এবার বললেন, 'খুব সাবধানমতো থাকবে। রাত্তিরে কেউ বেল টিপলে দরজা খুলবে না। এই সব এ্যাপার্টমেন্ট হাউসগুলো ডেঞ্জাবাস। যে কেউ যখন তখন হুট হাট ঢুকে পড়তে পারে। কার কী মতলব, কেউ তো জানে না।'

দীপা জানালো, সে দরজা খুলবে না।

উমাপতি আবাব বললেন, 'দিনের বেলাতেও কেউ বেল টিপলে আগে দরজা খুলবে না। দরজায় একটা ফুটোর ওপর কাচ বসানো রয়েছে। আগে কাচে চোখ রেখে দেখবে চেনা লোক কিনা। অচেনা হলে যদি কোনরকম সন্দেহ হয় কিছুতেই দরজা খুলবে না। বুঝলে ?'

দীপা ঘাড় কাত করলো, 'আচ্ছা।'

উমাপতি বললেন, 'কাচটা দেখে যাও—আমার কাছে এসো—'

দীপা এগিয়ে গেলে দরজার পাল্লায় যেখানে কাচ বসানো আছে, সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন উমাপতি। তারপর বললেন, 'আমি কাল আবার আসছি। কখন আসব টেলিফোনে জানিয়ে দেব। এবার দরজা বন্ধ করে দাও।' বলেই সামনের করিডর ধরে শেষ মাথায় লিফট বক্সগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন।

দীপা দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল ; আচমকা উমাপতি করিডরের মাঝামাঝি জায়গা থেকে ফিরে এলেন? ক'পা গিয়েই মত বদলে ফেললেন নাকি ভদ্রলোক? রাতটা কি শেষ পর্যন্ত এখানেই থেকে যাবার ইচ্ছা?

কয়েক সেকেণ্ড আগে উমাপতি যখন ফ্ল্যাট থেকে বেরুলেন নিজের অজান্তে দীপার দুর্ভাবনা অন্তত এই রাতটার জন্য কেটে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার সেই পুরনো ভয়টা ফিরে এল। উদ্বিগ্ন চোখে দীপা উমাপতিকে লক্ষ্য করতে লাগল।

উমাপতি কাছে এসে বললেন, 'দেখ, তুমি একা একটা মেয়ে এই নতুন জায়গায় থাকবে। আমার ভাবনাটা কিছুতেই যাচ্ছে না। একটা কাজ করলে কী হয়?'

দীপা কিছু না বলে শ্বাসরুদ্ধের মতো তাকিয়ে রইল।

উমাপতি বললেন, 'আমাদের এই চোদ্দ তলায় ও পাশের ফ্ল্যাটদুটোতে এখনও লোক আসে নি। তবে পাশের ফ্ল্যাটটায় এক বাঙালী ভদ্রলোক তাঁর ফ্যামিলি নিয়ে এসেছেন বলে শুনেছি। ওঁদের বলে যাই, তোমার দিকে একটু নজর রাখতে। রাত বিরোতে কখন কী দরকার হয়, কিছুই তো বলা যায় না।'

দীপার বুকের ভেতরকার আবদ্ধ বাতাস হুড় হুড় করে বেরিয়ে এল। অনেকটা আরাম বোধ করল সে। নাঃ, এখানে রাত কাটাবার ইচ্ছা নেই লোকটার।

দীপার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে উমাপতি সোজা পাশের ফ্ল্যাটের কলিং বেল টিপলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে একটি দারুণ স্মার্ট আর ঝকঝকে যুবক বেরিয়ে এল দীপারই সমবয়সী হবে, কি দু-এক বছর বেশিও হতে পারে। গায়ের রঙ ফর্সাও না, আবার কালোও না, দুয়ের মাঝামাঝি। মোটা ভুরু, মাঝারি চোখ, চওড়া কপালের ওপর বড় বড় চুল অবহেলায় পেছন

দিকে উল্টে দেওয়া। লম্বাটে মুখ তাব, থুতনির তলায় সুন্দর খাঁজ। হাইটও বেশ ভালোই, ছফুটের কাছাকাছি। টান-টান চেহারা। পরনে মড ছেলেদের মতো ট্রাউজার আর গেঞ্জি, খালি পা। তার চোখমুখ এই মুহূর্তে কোঁচকানো। অসময়ে বেল বাজাবার জন্য বোঝা যাচ্ছে যে সে বেশ বিরক্তই হয়েছে। রুক্ষ গলায় ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?'

উমাপতি বেশ হকচকিয়ে গেলেন, 'না, মানে বলছিলাম, আমি পাশের ফ্ল্যাটটা কিনেছি।' দীপাকে দেখিয়ে বললেন, 'আজ রাত্তিরে এই মেয়েটি এখানে একলা থাকছে। নতুন জায়গা তো, কখন কী বিপদ আপদ ঘটে যায়। তোমরা যদি ভাই একটু নজর রাখো বড় ভালো হয়।'

'ননসেন্স —' ভেতরে ঢুকে মুখের ওপর ঝড়াং করে দরজা বন্ধ করে দিল ছেলেটা।

ব্যাপারটা কী ঘটল, বুঝে উঠতে কয়েক সেকেন্ড লেগে গেল উমাপতির। তারপর গোটা মুখে বোকাটে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'যাক গে, পরের ভরসায় থেকে দরকার নেই। তোমাকে যেমন বলেছি রাতটা সেভাবে কাটিয়ে দাও। কাল সেই মেইড সারভেন্টটা এসে যাচ্ছেই। যাও, দরজা বন্ধ কর।'

উমাপতি আর দাঁড়ালেন না। করিডরের শেষ মাথায় গিয়ে লিফটের বক্সের ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

আর দীপা আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে প্রথমে এল ড্রইং রুমে। তারপর কী ভেবে সামনের দিকের ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল।

হু-হু করে লেকের দিক থেকে আগের মতোই উল্টোপাল্টা হাওয়া ছুটে আসছিল। রাস্তায় মার্কারি ল্যাম্প আর দুপাশের হাই-রাইজ বিল্ডিংগুলোতে আলো জ্বলছে। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে সাদার্ন এ্যাভেনিউকে অপার্থিব মনে হচ্ছে।

দূরমনস্কর মতো চারপাশের আলো, গাছপালা বা অন্যান্য দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে হঠাৎ দীপার চোখে পড়ল, দেড় শো ফুট নীচে উমাপতি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে একটা ট্যাক্সি ধরে ফেললেন।

উমাপতিকে আরেকবার দেখতে দেখতে একটা কথা মনে পড়ে গেল দীপার। আজ রাতের মত সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু কাল আছে, পরশু আছে, তার পরের দিন আছে। উমাপতি যাই বলুন না, রোজ রোজই কি তিনি আর সাড়ে ন'টার ভেতর বাড়ি ফিরে যাবেন? নগদ এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে এই ফ্যাশনেবল ফ্ল্যাট কিনে টি-ভি, টেলিফোন, সোফা বা ফ্রিজের মতো সাজিয়ে রাখার জন্য তিনি নিশ্চয়ই দীপাকে এখানে আনেন নি। কেউ আনেও না।

দীপা আর ভাবতে পারছিল না। এক সময় ব্যালকনি থেকে ভেতরে চলে এল সে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল, সেই সঙ্গে এই প্রথম টের পেল, খিদেও পাচ্ছে। কিন্তু এখন আর রান্নাবান্না চড়াতে ইচ্ছা করছে না। ফ্রিজ থেকে মাখন বার করে পাঁউরুটিতে মাখিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়ল সে।

চার

এবার উমাপতি সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া যেতে পারে।

উমাপতির এখন চুয়ান্ন চলছে। দেশ ছিল এক সময়কার ইস্টবেঙ্গলে তখনও পার্টিসান হয়নি। পূর্ব বাঙলা পশ্চিমবাঙলা মিলিয়ে তখন আনডিভাইডেড বেঙ্গল।

নগদ টাকা অর্থাৎ রেডি মানি খুব একটা উমাপতিদের ছিল না; তবে গোটা ইস্টবেঙ্গল জুড়ে ছিল প্রচুর প্রপার্টি। এক ঢাকা টাউনেই ছিল চোদ্দ পনেরটা বাড়ি। খুলনা আর চিটাগাঙেও তিন চারখানা করে। এছাড়া ফরিদপুরে কুমিল্লায় আর বরিশালে কয়েক হাজার বিঘে নানা টাইপের জমি। কোনটা রাইস-গ্রোয়িং, কোনটা জুটগ্রোয়িং।

ঢাকা শহরে থাকতেন উমাপতিরা। যা প্রপার্টি ছিল তা থেকে বছরে সে আমলেও লাখ লাখ টাকা আসতে পারত। আসে নি, তাব কারণ উমাপতির বাবা। লাইফ সম্পর্কে ভদ্রলোকের কোনবকম মেটিরিয়ালিস্টিক এ্যাপ্রোচই ছিল না। তাঁর জীবনেব ফাইভ প্রিন্সিপ্যালস ছিল খাওয়া, ঘুম, তাস, পাশা আব সন্তানের জন্মদান।

এর মধ্যে দ্বিতীয় এবং পঞ্চমটিকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক বেঁচেছিলেন ছেষট্টি বছর ; তার মধ্যে চুয়াল্লিশ বছর ঘুমিয়ে কাটিয়েছিলেন। জাগ্রত অবস্থায় বাকি চারটি কাজ তিনি বেশ প্যাসান দিয়েই করে গেছেন। বাবার এফিসিয়েন্সির জন্য উমাপতিরা মোট সাত ভাইবোন। দুটি ভাই, পাঁচটি বোন।

উমাপতিদের বাড়িতে লেখাপড়াকে কোনরকম প্রায়োরিটি দেওয়া হত না। স্কুলে ছেলেমেয়েদের নাম লেখানো থাকত ঠিকই। তবে বছর বছর ফেল করাটাই রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আচমকা কেউ পাশ করে গেলে সেটা হত সেই বছরের সেনসেসানাল পারিবারিক ঘটনা।

এক নাগাড়ে বার সাত-আটেক ফেল করার পর ঢাকা বোর্ড থেকে থার্ড ডিভিসনে উমাপতি যেবার দুম করে ম্যাট্রিকটা পাশ করে বসলেন সে বছরই দুটো মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেল। এক ঃ বাবার মৃত্যু। দুই ঃ পার্টিসান অফ ইণ্ডিয়া। পারিবারিক এবং পলিটিক্যাল, এই দুই দুর্ঘটনা উমাপতির লাইফের প্যাটার্ন একেবারে পাল্টে দিল। বলা যায়, দু হাতে তাঁর শিরদাঁড়াটা দুমড়ে বাঁকিয়ে দিল।

পার্টিসানের পর পরই দেশ ছেড়ে সবাইকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসতে হয়েছিল। তখন উমাপতির কাঁধে ছ'টি ছোট ছোট ভাইবোন আর বিধবা মায়ের রেসপন্সিবিলিটি। অথচ হাতে কিচ্ছু নেই। ইস্টবেঙ্গল থেকে একটা ঘষা তামার আধলাও তাঁরা নিয়ে আসতে পারেন নি। বাড়ি ঘর, জমি, এবং অন্যান্য প্রপার্টি—সব ফেলে স্রেফ পরনের জামাকাপড়টি নিয়ে ঝাড়া হাত-পায়ে চলে আসতে হয়েছিল।

কলকাতায় এসে বিরাটীর কাছে কিছুদিন একটা রিফিউজি ক্যাম্পে ছিলেন উমাপতিরা। ভাগ্যিস ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট রিফিউজিদের জন্য চাকরি-বাকরির একটা 'কোটা' ঠিক করে রেখেছিল। তাই থার্ড ডিভিসনের ম্যাট্রিকুলেট উমাপতি সেণ্ট্রাল পি-ডাব্লিউ ডি'তে একটা কেরানীগিরি পেয়ে গেলেন। কাজটা পাবার পর আর ক্যাম্পে থাকেন নি ; কলকাতায় বাড়ি-ভাড়া করে উঠে এসেছেন। বাড়ি আর কি : সেটাকে একটু ভালো টাইপের

বস্তি বললেই চলে। তবু ক্যাম্প লাইফের তুলনায় সেটা প্রোমোশনই।

কিন্তু লোয়ার ডিভিসন কেরানীর চাকরিতে কত আর মাইনে! ঐ টাকায় বাড়িভাড়া দিয়ে অতগুলো মানুষের বেঁচে থাকাটা অসম্ভব। উমাপতিকে তাই সকাল-সন্ধ্যে টুইশান করতে হতো। কিন্তু টুইশানটা পুরোপুরি সীজনাল ব্যাপার। এ্যানুয়াল পরীক্ষার দু মাস আগে শুরু, পরীক্ষার পর শেষ। তাই বছরের বাকি সময়টা অফিস ছুটির আগে বা পরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চা বা ধূপকাঠি বেচতেন। ছুঁচের পেছনে সুতোর মতো স্ট্রাগলটা সর্বক্ষণ তাঁর গায়ে আটকে থাকত। চতুর মাতাডোরদের মতো তিনি লাইফের সঙ্গে তখন বুল-ফাইট চালিয়ে যাচ্ছেন।

ঐ বস্তি টাইপের বাড়িটায় থাকতে থাকতেই ভাইবোনদের লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন উমাপতি। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর কাবলিওয়ালাদের কাছ থেকে চড়া ইণ্টারেস্টে টাকা ধার নিয়ে একজন একজন করে পাঁচ বোনের বিয়ে দিয়েছেন। লোকাল এম-এল-একে ধরে একমাত্র ভাইয়ের চাকরি জুটিয়েছেন। এই সব ঠাসা প্রোগ্রামের মধ্যে আর একটি কাজও করে ফেলেছেন উমাপতি। সেটি হল নিজের বিয়ে। বিয়ের পরই চাকরিতে একটা প্রোমোশন হয়েছিল। ফলে বস্তি টাইপের বাড়ি ছেড়ে তাঁরা আরেকটু ভালো একখানা বাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন।

বোনেদের বিয়ে মোটামুটি সুখেরই হয়েছে। তারা কেউ কলকাতায় থাকে না। বড় থাকে দুর্গাপুরে, মেজো এলাহাবাদে, সেজো ঘাটশিলায় আর ছোট মাদ্রাজের কাছে পেরাম্বুরে। ভাইয়ের বদলির চাকরি; সে দিল্লী-লক্ষ্মৌ-পুনা-বরোদায় শাটলককের মতো দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াচ্ছে। ভাইবোনদের সঙ্গে এখন উমাপতির যোগাযোগটা দাঁড়িয়েছে ইণ্ডিয়ান পোস্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্ট-মেণ্টের মারফত। ক্বচিৎ কখনো দু বছরে চার বছরে তাদের সঙ্গে একবার দেখা হয়। মা পার্টিশনের পর এখানে এসেই মারা গেলেন।

যাই হোক, নেচারের মধ্যে কোথাও নাকি ভ্যাকুয়াম বলে কিছু নেই। ভাইবোনেরা সেটেলড হতে না হতেই উমাপতির স্ত্রী

ছেলেমেযেব বান ডাকিয়ে দিয়েছিল ! একটা বাচ্চা চিত থেকে কাত হতে শেখাব আগেই মহিলা হাসপাতালেব মেটার্নিটি ওয়াডে চলে যেত। 'দো আউব তিন বাচ্চে'র চাবদিকে যে এত শ্লোগান, এত পোস্টাব, এত হোর্ডিং, সিনেমায় সিনেমায় এত স্লাইড, সে সব দিকে তাব ভ্রূক্ষেপ নেই। ক'দিন আগে উমাপতিব ম্যাবেড লাইফেব সিলভাব জুবিলী হযে গেল। এই পঁচিশ বছবে স্ত্রীব দিক থেকে গিফট হলো আটটি ছেলেমেয়ে। অবশ্য এ ব্যাপাবে উমাপতিব কনট্রিবিউসান কম না। মানুষ হিসেবে তিনি ঐতিহ্যে বিশ্বাস কবেন, বাবাব সাতটি ছেলেপুলে। তিনি পাবিবাবিক ট্র্যাডিসান ভাঙাব জন্য স্ত্রীকে আশকাবা দেন নি।

উমাপতিব স্ত্রীব বয়স উনচল্লিশ। বাব বাব মেটার্নিটি ওযাডে গেলে মেয়েদেব শবীব ভাঙে। অ্যানিমিযা সূতিকা ইত্যাদি চাবদিক থেকে শকুনেব মতো ঘিবে ধবে। কিন্তু মহিলাব সব উল্টো। যত বাচ্চা হয ততই ওজন বাড়ে, বক্তচাপও সেই অনুপাতে বাড়তে থাকে। বিবাহেব বৌপ্য জযন্তী উৎসবেব দিন ওজন নিযে দেখা গেছে এখন [illegible] [illegible] [illegible] এক দুই [illegible] পঁচিশ কিলো সাতাশ গ্রাম। ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স [illegible] চৌষট্টি-বাহান্ন। ওব মাপে দোকানে ব্লাউজ পাওয়া যায না।

বিযেব সময এবং তাবপব কিছুদিন বেশ শান্তই ছিল। মহিলা নেচাবটা ভাবি নবম। মেজাজ আইস-কুল। কিন্তু একেব পব এক ছেলেমেযে হবাব নাট বেজাল্ট দাঁড়াল এই, মেজাজেব শীতলতা কেটে উত্তাপ চড়তে লাগল। ঠাণ্ডা হযে থাকলে এত বড় একটা ইনফ্যান্ট্রি ট্যাকল কবা অসম্ভব। ফ্যামিলিতে পুবো অ্যানার্কি এসে যাবে। স্ত্রী এখন উমাপতিব সংসাবেব ডিক্টেটব। শবীবে হেভিওযেটেব জন্য বেশি নড়াচড়া কবতে পাবে না কিন্তু এক জাযগায বসেই গোটা বাড়িটাকে সে কনট্রোল কবে থাকে। চলাফেবা কবতে না পাবাব ক্ষতিটা মহিলা পূবণ কবে নিয়েছে মুখে, সেকেণ্ডে তাব গলা থেকে বন্দুকেব ছববাব মতো তিন শো পঞ্চাশটা কবে শব্দ বেবিয়ে আসে। হঠাৎ শুনলে মনে হয় শান্তা-প্রসাদেব আঙুল তবলায় দ্রুত লযেব বেলা তুলেছে।

পৃথিবীব জলভাগ স্থলভাগেব মতো উমাপতিব তিনভাগ

মেয়ে একভাগ ছেলে। অর্থাৎ মেয়ের সংখ্যা ছয়, ছেলের দুই। বড় মেয়ের বয়স চব্বিশ, তারপর থেকে দেড় বছর দু বছরের মাথায় মাথায় অন্য ছেলেমেয়েরা হয়েছে। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন উমাপতি ; তার ছেলেপুলে হয়ে গেছে। তিন জেনা-রেসনের কাঁধে বসে উমাপতি এখন একজন প্রাউড গ্র্যাণ্ড ফাদার।

এ ছাড়া আরো কিছু বলবার আছে। উমাপতির হেলথ্ একেবারেই ভালো না। হার্ট, কিডনি, কোমর—যেখানেই হাত দেওয়া যাক সব ড্যামেজড্। পার্টিসানের পর পশ্চিম বাঙলায় রিফিউজি হয়ে পা দিতে না দিতেই লাইফের সঙ্গে একটানা বুল ফাইট শুরু হয়েছিল। বাঁচার জন্য তিরিশ বছরের ম্যারাথন লড়াই তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে দিয়েছে। বাইরে থেকে চর্বির থাক দেখলে কী হবে, ভেতরটা একেবারে ফাঁপা। সেখানে নানারকম রোগের একটা এ্যাসেম্বলি হাউস তৈরি হয়েছে।

লাইফে শখ-টখ বলে কিছুই নেই উমাপতির। তবে স্ত্রীর একটা বাতিক আছে, তীর্থের বাতিক। বিয়ের পর দুম-দাম তিন-চারটে ছেলেমেয়ে যেই হয়ে গেল ঐ বাতিকটা অমনি চাগিয়ে উঠল। এটা কিসের রি-অ্যাকসান উমাপতি জানেন না। যাই হোক, দুবছর তিন বছর পর কিছু টাকা জমলে স্বামীকে নিয়ে তখন থেকে সে ট্রেনের থার্ড ক্লাসে করে কোন তীর্থে চলে যেত ; উঠত কোন ধর্মশালায়। যত সস্তায় কাজ সারা যায়। তখন তো উমাপতিদের অঢেল পয়সা হয় নি।

পঁচিশ বছরের ম্যারেড লাইফে স্ত্রীর আঁচল ধরে মোট বারোটি তীর্থ করেছেন উমাপতি। কামাখ্যা, পুরী, দ্বারকা, অমরকণ্টক, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, রামেশ্বর, মীনাক্ষী, তিরুপতি এবং কাশী। এই লিস্টে ওয়েস্ট বেঙ্গলের তীর্থস্থানগুলো ধরা হয়নি। একটা লাইফে এক ডজন মেজর তীর্থ করা খুব সহজ না। পুণ্যের ডিপোজিট এক কথায় তাঁর একসেলেণ্ট।

এইভাবেই চলে যাচ্ছিল, এইভাবেই চলে যেত। আচমকা উমাপতির পঞ্চাশ বছর বয়সে আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

খবরের কাগজে একদিন দুম করে বিজ্ঞাপন বেরুলো ইস্ট পাকিস্তানে যে সব ভারতীয় নাগরিক বাড়িঘর প্রপার্টি ফেলে

এসেছিল তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এর জন্য 'অফিস অফ দি কাস্টোডিয়ান অফ এনিমি প্রপার্টি ফর ইণ্ডিয়ার' অফিসে দরখাস্ত চাওয়া হয়েছে। অফিসটা বোম্বাইতে।

বিজ্ঞাপনটা উমাপতি লক্ষ্য করেন নি। লাইফের সঙ্গে অনবরত বুল ফাইট চালাতে গিয়ে খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ার সময় পেতেন না। তিনি না দেখলেও কোত্থেকে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে পরমেশ সেন এসে হাজির।

মড পোশাক পরা ঝকঝকে সাহেবমার্কা পরমেশকে দেখে প্রথমটা উমাপতি চিনতেই পারেন নি। পরিচয়-টরিচয় দেবার পর পারলেন।

পরমেশ ঢাকায় উমাপতির সঙ্গে এক স্কুলে পড়তেন, একই বছর দু-জনে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। কিন্তু পার্টিসানের পর যে যেখানে পেরেছে ছিটকে পড়েছে। উঁইয়ের ঢিবি ভেঙে গেলে যা হয়।

চেনার পরও বিস্ময় কাটছিল না উমাপতির। চোখের তারা ফিক্সড করে তিনি ছেলেবেলার বন্ধুকে দেখছিলেন।

দেশে থাকতে দারুণ খারাপ অবস্থা ছিল পরমেশদের। লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলির পার্মানেন্ট অভাব আর একগাদা ভাইবোনের মধ্যে মানুষ হয়েছেন। চেহারা ছিল বোগা, দুর্বল। শরীরে মাংস-টাংস ছিল না। চামড়া ফুঁড়ে গজালের মতো হাড় বেরিয়ে থাকত। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে যত ক্যালরির দরকার তার দশভাগের এক ভাগও জুটত না! তবে ছাত্র হিসেবে ব্রাইট ছিলেন।

আটাশ বছর আগের সেই রোগা হাড়-গ্যারগেরে পরমেশ একেবারে বদলে গেছেন। বয়স যদিও পঞ্চাশের কাছাকাছি তবু তাঁকে দুর্দান্ত স্মার্ট, সফিস্টিকেটেড আর স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছিল। পরমেশ প্রথমে পুরানো দিনের কথা তুলে জানিয়েছিলেন, দেশ ছেড়ে এপারে এসে আর সব রিফিউজিদের মতো তাঁকেও দারুণ স্ট্রাগল করতে হয়েছে। চাকরি নিয়ে ফ্যামিলি বাঁচিয়েছেন। সেই সঙ্গে নাইট ক্লাস করে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছেন, বি-এ পাশ করেছেন, তারপর প্রাইভেটে এম-এ'টাও। চেষ্টা ছিল, এ্যাম্বিশন

ছিল। চাকরিতে প্রমোশন পেতে পেতে তিনি এখন তাঁর কোম্পানির টপ একজিকিউটিভ। বিয়ে করেছেন বড়লোকের মেয়েকে। যোধপুর পার্কে কোম্পানির দেওয়া ফ্যাশনেবল ফ্ল্যাটে থাকেন। ছিমছাম স্ট্রীমলাইনড ফ্যামিলি, স্বামী-স্ত্রী এবং দুটি মাত্র ছেলে-মেয়ে। মেয়ে পড়ে লা মার্টিনিয়ারে, ছেলে যাদবপুর ইউ-নিভার্সিটিতে।

টপ একজিকিউটিভ হবার পরও লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক পুরনো বন্ধুকে খুঁজে বার করার জন্য দারুণ খুশী হয়েছিলেন উমাপতি, গর্বও হচ্ছিল। বলেছিলেন, 'তুমি যে ভাই এ্যাদ্দিন পর আমার বাড়ি আসবে ভাবতেও পারিনি। কত বড় হয়েছ তুমি! কী ভালো যে লাগছে!'

পরমেশ বলেছিলেন, 'কী আশ্চর্য, দেশে থাকতে তুমি ছিলে আমার বুজম ফ্রেন্ড। এতদিন ঠিকানা জানতাম না, তাই আসতে পারিনি। জানলে কবেই চলে আসতাম। একটু থেমে কিছু না ভেবেই যেন হঠাৎ বলেছিলেন, 'নিউজ পেপারে একটা বিজ্ঞাপন দেখেছ?'

'কিসের বিজ্ঞাপন?'

অফিস অফ দি কাস্টোডিয়ান অফ এনিমি প্রপার্টির কথাটা জানিয়ে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা বলেছিলেন পরমেশ।

উমাপতি বলেছিলেন, 'কই, এমন কিছু আমার চোখে পড়ে নি।'

যে কাগজে বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছিল তার একটা কাটিং পকেটে করে নিয়ে এসেছিলেন পরমেশ। সেটা বার করে বলেছিলেন, 'এই দেখ।'

দেখা হয়ে গেলে জিজ্ঞাসু চোখে বন্ধুর দিকে তাকিয়েছিলেন উমাপতি।

পরমেশ বলেছিলেন, 'দেশে তো তোমাদের প্রচুর প্রপার্টি ছিল।'

'হ্যাঁ।'

'সে-সবের ডকুমেণ্ট-টকুমেণ্ট সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলে?'

উমাপতির মনে পড়ে গিয়েছিল, দেশ থেকে এক কাপড়ে চলে এলেও মা দুটো বড় বড় ব্যাগ বোঝাই করে বাড়িঘর জমিজমার যাবতীয় দলিল সঙ্গে করে এনেছিলেন। তারপর ওঁরা যতবার

ঠিকানা বদলেছেন দলিলগুলো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। উমাপতি বলেছিলেন, 'এনেছিলাম।'

'ফাইন। এবার এক কাজ কর, বোম্বাইতে কমপেনসেসনের জন্যে একটা এ্যাপ্লিকেসন করে দাও।' বলে একটু থেমে পরমেশ আবার বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, আমিই সব এ্যারেঞ্জমেণ্ট করে দেব। তুমি শুধু এ্যাপ্লিকেসনটা পড়ে নিচে সই করে দিও।'

সত্যি সত্যি পরমেশ যাবতীয় বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। তবে উমাপতির খুব একটা ভরসা ছিল না। তাঁর মনে হয়েছিল, খাটুনিই সার হবে। কাজের কাজ কিছুই হবে না।

কিন্তু দু মাস যেতে না যেতেই বোম্বাই থেকে তলব এসেছিল, জমি এবং বাড়ির দলিলপত্র নিয়ে দেখা করতে বলা হয়েছে।

পরমেশ উমাপতিকে সঙ্গে করে বোম্বাই গিয়েছিলেন। এবং কি আশ্চর্য, তার মাস দুয়েক বাদেই কয়েক লাখ টাকা কমপেনসেসন পেয়ে গিয়েছিলেন উমাপতি। ভাইবোনদের ভাগ মিটিয়ে দেবার পরও তাঁর হাতে নীট দশটি লাখ থেকে গেল।

প্রথম দিকের কয়েকটা বছর বাদ দিলে শুধু বেঁচে থাকার জন্য একটানা ম্যারাথন লড়াই চালাতে হয়েছে উমাপতিকে। জীবনটা উল্টোপাল্টা হাওয়ায় ঘুড়ির মতো লাট খেতে খেতে এগিয়ে যাচ্ছিল। আচমকা পঞ্চাশ বছর বয়সে নগদ দশ লাখ টাকা উমাপতির লাইফের পুরো প্যাটার্নটাই ওলট-পালট করে দিল।

পরমেশ বললেন, 'এখন তো তুমি মিলিওনেয়ার। টাকাগুলো নিয়ে কী করবে ভেবেছ?'

এত টাকা দুম করে পেয়ে যাবেন, পার্টিসানের পর আটাশ বছরে এমন একটা ব্যাপার ঘটবে, স্বপ্নেও ভাবেননি উমাপতি। তাঁর ব্রেনের সেলগুলো ঠিকমতো কাজ করছিল না, কেমন যেন জট পাকিয়ে গিয়েছিল। বন্ধুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী করা যায় বল তো?'

এক সেকেণ্ডও না ভেবে পরমেশ বলেছিলেন, 'হোল লাইফ স্ট্রাগলই করে গেলে। আর ক' বছরই বা বাঁচবে! এবার একটু এনজয়-টেনজয় করো।'

উমাপতি জীবনকে এনজয় করার যে সব কৌশল জানতেন প্রথম

দিকে সেগুলো কাজে লাগালেন। টাকাটা হাতে পেয়েই চাকরিটা ছাড়লেন সবার আগে। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত পুরো সাতটি ঘণ্টা যদি দাসত্বের জন্য সংরক্ষিত থাকে, লাইফকে এনজয় করার সময় পাবেন কখন? সাত ঘণ্টায় ডালহৌসী স্কোয়ারের একটা অফিস স্তূপাকার ফাইলের ভেতর তাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে শরীর থেকে সব শাঁস বার করে নেয়। তারপর আর এমন সারপ্লাস এনার্জি থাকে না যাতে একটু আনন্দ-টানন্দ করা যায়। চাকরি ছেড়ে টালিগঞ্জ রেল ব্রিজের কাছে একখানা তেতলা বাড়ি কিনলেন উমাপতি। তারপর একে একে আসতে লাগল টি-ভি, স্টিরিও, রেডিও-গ্রাম, এয়ার-কুলার, ট্রানজিস্টার, টেপ রেকর্ডার, সোফা, টেলিফোন, দামী দামী খাট, কার্পেট ফোমের গদি ইত্যাদি ইত্যাদি। বাথরুমে হাতীর দাঁতের মতো সাদা ধবধবে বাথটব এলো, আর প্রসেসান করে এলো এক ডজন চাকর-বাকর-আয়া বাবুর্চি। একটা নতুন ঝকঝকে গাড়িও কেনা হলো। কিন্তু দশ লাখ টাকা তো একটা দুটো পয়সা না। বাড়ি, ফার্নিচার, টি-ভি, ফ্রিজ-ট্রিজে তিন লাখ টাকার বেশি খরচ করা গেল না। বাকি সাত লাখ টাকা উমাপতি ব্যাঙ্কে রাখলেন! চাকর-বাকররা তাঁর পা টিপে দ্যায়, বাথটবে দামী সাবানের ফেনার ভেতর শুয়ে তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েরা স্নান করে। মোটর করে স্ত্রীকে নিয়ে বিকেলবেলা ভিক্টোরিয়া, গঙ্গার পাড় কিংবা লেকের দিকে বেড়াতে যান। গরমের দিনে তেষ্টা পেলে ফ্রিজ থেকে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল বা সরবত আসে। ঘরে বসেই সন্ধ্যেবেলা টি-ভিতে হিন্দি ফিল্মে হেমা মালিনী, ধর্মেন্দ্র কি জীনত আমনকে দেখেন। উমাপতি এখন খুবই সুখী। এ পারফেক্ট হ্যাপি ম্যান। তাঁর ধারণায় আনন্দের বা সুখের বাউণ্ডারি লাইন ঐ পর্যন্তই টানা।

তা ছাড়া টাকাটা হাতে আসার পর ছেলেমেয়েদের বছর বছর জন্মদিন, উমাপতি ও তাঁর স্ত্রীর বার্থ-ডে, বিবাহ বার্ষিকী ইত্যাদি বেশ জাঁকজমক করেই হতে লাগল।

এত সুখের মধ্যে একটুখানি খিঁচ থেকে গেছে। পঞ্চাশ বছর একটানা লাইফের সঙ্গে বুল ফাইট চালাবার পর শরীরে সারবস্তু আর কিছু নেই। কিডনিটা ড্যামেজড, স্টমাকে গ্যাসট্রিক, রক্তে

হাই প্রেসার এবং সুগার, কোমরে আর হাঁটুতে বাত। ডান চোখে ক্যাটারাক্ট হয়েছিল, সেটা কাটানো হয়েছে। নার্ভে মাঝে মাঝে যন্ত্রণা হয়। ডাক্তাররা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে লম্বা চার্ট করে দিয়েছেন। আলু, নুন, আর চিনি একেবারে বারণ। স্যাচুরেটেড ফ্যাট অর্থাৎ ঘি-টি চলবে না। বড় তেলওলা মাছ বা চর্বিওলা মাংস তাঁর পক্ষে বিষ। খেতে হলে চারা পোনা আর কচি মুরগির স্টু। ভাতটাও পুরো বাদ দিতে চেয়েছিল। উমাপতি তাদের হাতে পায়ে ধরে সপ্তাহে একদিন এক কাপের ব্যবস্থা করে ছেড়েছেন।

সকালে এক স্লাইস স্যাঁকা পাঁউরুটি আর চিনি-ছাড়া সরতোলা এক গেলাস দুধ উমাপতির ব্রেকফাস্ট। তার একঘণ্টা পর বিনা চিনির চা। তার একঘণ্টা পর আবার চা। দুপুরে দু খানা আটার রুটি, সঙ্গে এক বাটি গ্রীন ভেজিটেবলের সুপ, খানিকটা চারা মাছ সেদ্ধ, খানিকটা মাংসের স্টু। বিকেলে শুধু এক কাপ চা। রাত্তিরে আবার দু খানা আটার রুটি, মাংস এবং মাছের স্টু, গ্রীন ভেজিটেবল সেদ্ধ। এর ফাঁকে ফাঁকে বাতের জন্য ব্লাড সুগার আর প্রেসারের জন্য, গ্যাসট্রিকের জন্য ক্ষেপে ক্ষেপে নানারকম ট্যাবলেট বরাদ্দ রয়েছে। দিনে সব মিলিয়ে ষোলটা ক্যাপসিউল আর ট্যাবলেট খান উমাপতি। একদিন পর পর তাঁর প্রেসার মাপা হয়। সপ্তাহে একবার করা হয় ই-সি-জি, একবার চেক করা হয় ব্লাড সুগার। এর নড়চড় হবার উপায় নেই। ডাক্তার যা ব্যবস্থা করে দিয়েছে তার যাতে একচুল এদিক ওদিক না হয় সে জন্য বাইশটা চোখ মেলে তাকিয়ে আছে উমাপতির স্ত্রী। স্ত্রীর চোখে ধুলো ছিটিয়ে কিছু করার যো নেই।

যাই হোক, প্রথম দিকে কিছুই বলেন নি পরমেশ। প্রশ্রয় দেবার ভঙ্গিতে বন্ধুর সুখের দৌড়টা দেখে গেলেন। তারপর চোখ কুঁচকে বলেছেন, 'ব্যস?'

উমাপতি বলেছেন, 'আবার কী? গাড়ি হয়েছে, বাড়ি হয়েছে, টি-ভি হয়েছে, ফ্রিজ হয়েছে। এ সব করতে পারব, লাইফে কখনও ভেবেছি! আই এ্যাম রিয়ালি হ্যাপি।'

'তোমার সুখের এটাই তা হল পীক পয়েন্ট?' পরমেশ যেন রীতিমত অবাকই হয়ে গেছেন।

উমাপতি কথাটা বুঝতে না পেরে বলেছিলেন, 'মানে।'

'মানেটা সিম্পল। তুমি একেবারে মিডল ক্লাস এ্যাঙ্গল থেকে কথা বলছ। বাট ডোণ্ট ফরগেট, ইউ আর এ মিলিওনেয়ার নাউ। লাইফের এ্যাটিচুডটাই তোমার পাল্টে ফেলতে হবে। এনজয় লাইফ লাইক এ মিলিওনেয়ার—'

পরমেশের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ উমাপতি। এই যে তাঁর বাড়ি-গাড়ি, টাকা-পয়সা, এত দামী দামী আরামের জিনিস রয়েছে—এ সবই পরমেশের জন্য। পরমেশ কিছু একটা বললে সেটা উড়িয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব না। মিলিওনেয়াররা কেমন করে লাইফকে এনজয় করে তিনি জানেন না। এ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহও হচ্ছিল, একটু একটু ভয়ও হচ্ছিল। আবার তিনি জানতে চেয়েছিলেন, 'কিভাবে?'

'সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি সব এ্যারেঞ্জমেণ্ট করে দেব।'

'দেখ ব্রাদার, উওম্যান আর ওয়াইন ছাড়া এনজয়মেণ্টের সার্কেল কমপ্লীট হয় না।'

উমাপতি চমকে উঠেছিলেন। হাতজোড় করে বলেছিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করে দাও ভাই, ওসব আমি পারব না।'

পরমেশ ধমকে উঠেছিলেন, 'পিউরিটানদের মতো তোমার কথাবার্তা। নাগা সন্ন্যাসীদের মতোই যদি লাইফ কাটিয়ে দেবে তা হলে ঐ টাকাগুলো আদায় করবার কী দরকার ছিল?'

'কিন্তু ভাই, তুমি তো জানো আমার চোখে ক্যাটারাক্ট, কিডনি ড্যামেজড, ব্লাডে সুগার, আর হাই প্রেসার, কোমরে বাত, আর সবার ওপর ধুমাবতীর মতো বউ। তোমার কথামতো চললে আমাকে আর প্রাণে বাঁচতে হবে না।'

'তুমি এক নম্বর কাওয়ার্ড। আচ্ছা, একটা কথার উত্তর দাও তো। কারেক্ট অ্যানসার চাই—'

'কী?'

পরমেশ জিজ্ঞেস করেছেন, 'বউয়ের আঁচল ধরে ধরে কতগুলো তীর্থ করেছ?' তীর্থের কথা উমাপতি তাঁকে আগেই জানিয়েছিলেন।

উমাপতি বলেছেন, 'তা, মেজর বারোটা তীর্থ হবে।'

'দেখা যাচ্ছে পুণ্যের ডিপোজিট তোমার অনেক। একটু আধটু ফুর্তি করলে কোন ক্ষতি হবে না, বরং পুণ্যের সঙ্গে ওটা ব্যালান্সড্ হয়ে যাবে ব্যালান্স না করলে লাইফের চার্ম থাকে না হে। পাপ-পুণ্য আনন্দ-ফুর্তি, দুঃখ-টুঃখ—লাইফ হলো সব কিছুর কেমিক্যাল কমপাউণ্ড। সবগুলো সমান প্রোপরসানে মেলাতে হয়। কোনটা বাদ দিলেই চলে না। টাকা ছিল না, তাই পুণ্যটা এ্যাডভান্স করে ফেলেছিলে। এখন টাকা হয়েছে, ফুর্তিটা করে ফেল।' প্রায় দার্শনিকের মতো থেমে থেমে নিরাসক্ত গম্ভীর মুখে বলে গিয়েছিলেন পরমেশ।

'ফরবিডন ফ্রুট' অর্থাৎ নিষিদ্ধ ফলের দিকে কার না লোভ থাকে। পরমেশ সেই লোভটাকে খোঁচা মেরে মেরে উস্কে দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিধা আর ভয়টা কিছুতেই কাটছিল না। আসলে পঞ্চাশটা বছর একরকম কাটিয়ে এসেছেন। হঠাৎ এতদিনের ফ্রেম ভেঙে একরোখা ডেসপারেট হবার মতো সাহসটা আর হয়ে উঠছিল না। দ্বিধান্বিতভাবে বলেছিলেন, 'কিন্তু—'

'তুমি তোমার বউয়ের কথা ভাবছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'ও ঠিক হয়ে যাবে। হাজব্যাণ্ডের মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স থাকলে সব 'ঠিক হয়ে যায়।'

'আমার শরীর—'

'শরীরটা হলো এ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার। যেভাবে এ্যাডজাস্ট করবে সেভাবেই চলবে। এতদিন ক্যাটারাক্ট-গ্যাসট্রিক-প্রেসার-সুগারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছ। ওদের বাদ দিয়ে কিছু ভাবতে পারছ না। ফুর্তি-টুর্তি কর, দেখবে সেগুলোর সঙ্গেই বডি এ্যাডজাস্ট করে ফেলেছে।'

পরমেশ পিলার পুঁতে পুঁতে তাঁর ধারণা অনুযায়ী সুখ এবং এনজয়মেন্টের একটা নির্দিষ্ট এরিয়া আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন। উমাপতিকে তিনি সেখানে টেনে নিয়ে গেলেন।

শুভারম্ভ হিসেবে প্রথমেই উমাপতিকে 'ব্লু মুন ক্লাবে'র মেম্বার করে দিয়েছিলেন পরমেশ। উমাপতি এতকাল, এমন কি দশ লাখ

টাকা পাবার পরও, ধুতি-পাঞ্জাবি পরেই কাটিয়েছেন। ক্লাবে ঢুকবার পর পরমেশ ধুতি ছাড়িয়ে তাঁকে ট্রাউজার ধরালেন। পরমেশের ইচ্ছা ছিল একালের মড ছোকরাদের মতো হাতীর কান বেলবটম পরাবেন বন্ধুকে কিন্তু উমাপতির তাতে ঘোর আপত্তি। কেননা তাঁর ছেলেরা এবং জামাই ঐ সব পোশাক পরে থাকে। শ্বশুর-জামাই বা বাপ-ছেলের পোশাকের মধ্যে ডিস্টিংসন থাকবে না। সেটা উমাপতির মনঃপূত নয়। পরমেশ বলেছিলেন, তুমি একেবারে নাইনটীনথ সেঞ্চুরিতে পড়ে আছ হে। আজকাল পোশাকের ব্যাপারটা খুব সিম্পল হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়ে, মিডল-এজেড, ইয়ংম্যান, ওল্ড ফেলা—সবার এক ড্রেস।'

'তা হোক, আমি ভাই নাইনটীনথ-সেঞ্চুরিতেই পড়ে থাকতে চাই।'

অগত্যা কী আর করা। ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে যেরকম এক বগ্‌গা ঢলঢলে ফুল প্যাণ্ট পরত লোকে সেইরকম দামী কাপড় দিয়ে খানকতক তৈরি করা হলো উমাপতির জন্য। আজকাল ঐরকম কাটিং আর চালু নেই, এখানকার টেলাররা অমন প্যাণ্ট কাটতেও শেখেনি। কাজেই ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়ে পুরনো আমলের সাজপোশাকের ছবি দেখে টেলরদের প্যাণ্টগুলো বানাতে হয়েছে। এর পেছনে যে সময় আর খাটুনি লেগেছে তার জন্য প্যাণ্ট পিছু একসট্রা পনের টাকা করে মজুরি দিতে হয়েছে। প্যাণ্টের সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে হাতায় ডবল কাফ দেওয়া পুরনো আমলের ফুল শার্ট। এর জন্যও মেকিং চার্জ বেশি পড়েছে।

কিন্তু ট্রাউজার-ফ্রাউজার পরার অভ্যাস কোনকালেই ছিল না উমাপতির। কোমরে ধুতির কষি গেরো দিয়ে না বাঁধলে মনেই হয় না, কিছু পরেছেন। খালি ভয়, এই বুঝি ঢলঢলে প্যাণ্ট কোমর থেকে হড়কে নেমে গেল। ভয়টা যদিও অকারণ তবু সাবধানের মার নেই। কাঁধের ওপর দিয়ে তাই বাচ্চাদের নিকার-বোকারের মতো ফিতে আটকে নিয়েছেন।

ক্লাবের মেম্বার হবার পর থেকেই পরমেশ উমাপতিকে হুইস্কি ধরাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উমাপতি হচ্ছেন পুরনো আমলের। হেক্‌নি ক্যারেজ, ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলাই তাঁর অভ্যাস। একেবারে

জেট প্লেনের স্পীডে হুইস্কি পর্যন্ত এগুতে তাঁর সাহস হয় নি।

হুইস্কিতে পৌঁছুবার আগে অনেকগুলো স্টেজ রয়েছে। বীয়ার, শেরি, পোর্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। পরমেশদের চাপে এবং জোরাজুরিতে শেষ পর্যন্ত ড্রিংকের অ-আ-ক-খ থেকে শুরু করেছেন অর্থাৎ বীয়ার ধরেছেন। বেশ কয়েক মাস পেরুতে চলল কিন্তু প্রাইমারি স্টেজেই পড়ে আছেন তিনি। বীয়ারের ওপর আর উঠতে পারেন নি। এদিক থেকে একটা এফিসিয়েন্সি বার-এ তিনি আটকে গেছেন, কিছুতেই আর এগুতে প্যারছেন না। তার কারণ স্ত্রী।

পরমেশ বলেছেন, 'ড্রিংকের ব্যাপারে তোমার পারফর্মেন্স ভীষণ পুওর, কোনরকম এ্যাডভান্সমেণ্ট হচ্ছে না।'

কাঁচুমাচু মুখ করে উমাপতি বলেছেন, 'কী করব ভাই, তুমি তো জানোই ঘরে আমার ছিন্নমস্তা বউ রয়েছে।'

পরমেশ বলেছেন, 'তুমি একেবারে স্ত্রীর আঁচলের তলায় ডোমেস্টিক এ্যানিমেলটি হয়েই রইলে। তোমার মতো কাওয়ার্ড আমার লাইফে দ্বিতীয়টি দেখলাম না।'

উমাপতি আরো কুঁকড়ে গেছেন, 'সে তুমি যা-ই বলো ভাই, আমার দৌড় আমি জানি। আমার লিমিট ঐ পর্যন্ত। পঞ্চাশ বছরের হ্যাবিট কাটিয়ে বীয়ার ধরেছি! এটাই আমার পক্ষে রেভোলিউসান।'

পরমেশ আর জোর করেনি। বেশি টানা-হ্যাঁচড়া করলে তার নীট রেজাল্ট ভালো হয় না।

উমাপতির বীয়ার খাওয়াটা দেখবার মতো। তাঁর 'কোটা' এক মগ মাত্র। ক্লাবে আসার সময় বড় সিলভারের কৌটো বোঝাই করে পান, সুপুরি এলাচ লবঙ্গ দারুচিনি নিয়ে আসেন। বীয়ার খাবার পর গণ্ডা গণ্ডা পান আর মুঠো মুঠো সুপুরি-লবঙ্গ-এলাচ খেয়ে গন্ধ মেরে তবে বাড়ি ফেরেন।

টাকার গন্ধে গন্ধে পরমেশ যেমন এসে জুটেছেন তেমন আরো একজন উমাপতির গায়ে স্টিকিং গামের মতো জুড়ে গেছেন। তিনি হলেন ভূপতি সামন্ত। উমাপতি যে অফিসে যে সেকসানে ক্লার্ক ছিলেন, ভূপতি তার সেকসান ইন-চার্জ। ভদ্রলোক উমাপতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই পয়সায় 'ব্লু মুন ক্লাবে'র মেম্বার হয়েছেন। কথা-টথা

বলে সময় বা এনার্জি নষ্ট করেন না। ক্লাবে ঢুকেই তাঁর একমাত্র কাজ হলো হুইস্কির গেলাস নিয়ে বসা আর গাদা গাদা খাবার আনিয়ে গোগ্রাসে গিলে যাওয়া। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কাছাকাছি। ষাট বছরের সব খিদে আর তেষ্টা নিয়ে ভূপতি যেন উমাপতির কমপেনসেসন পাওয়ার আশায় মুখিয়ে বসে ছিলেন।

দুই বন্ধুকে নিয়ে ক্লাবে বীয়ার খেয়ে, বাড়িতে টি-ভি দেখে, বউকে নিয়ে বিকেলবেলা নতুন গাড়িতে ময়দানে হাওয়া খেয়ে উমাপতির সময় দিব্যি কেটে যাচ্ছিল।

হঠাৎ একদিন পরমেশ বললেন, 'ফার্স্ট' বুকেই আটকে রইল যে! এবার সেকেণ্ড চ্যাপ্টারটা ওপেন করে দাও।'

বুঝতে না পেরে উমাপতি জিজ্ঞেস করেছেন, 'সেটা কী?

'বাঃ, এর মধ্যেই ভুলে গেলে। তোমার মেমোরি বড্ড পুওর হে। বলে একটু থেমে তক্ষুনি আবার শুরু করেছেন, 'লাইফকে এনজয় করার কথা হয়েছিল না?'

'তা তো হয়েছিলই।' ভয়ে ভয়ে উমাপতি বলেছেন, 'এনজয় তো করছিই।'

'তা করছ। তবে পুরোপুরি করছ কোথায়? ফুল এনজয়মেণ্ট একে বলে না। ওয়াইন আর ওম্যান ছাড়া আনন্দ কোথায়?'

'ওয়াইন তো ভাই ধরেছি। এই যে—' 'বীয়ারের মগটা তুলে দেখিয়ে ছিলেন উমাপতি।

নাকের ভেতর অদ্ভুত একটা শব্দ করে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হেসেছিলেন পরমেশ, 'বীয়ার আবার ওয়াইন হলো কবে হে। অবশ্য ওর ভেতর কয়েক পারসেণ্ট এ্যালকোহল আছে। তোমার জন্যে কনসেসন করে না হয় ধরেই নিলাম ওটা মদ। কিন্তু আসল যে ব্যাপারটা, মানে ওম্যানের কী হবে? এবার তা হলে ব্যবস্থা করি?'

আগেও যা বলেছিলেন এবারও ঠিক তাই বলেছেন উমাপতি, 'তোমাকে তো ভাই জানিয়েছি আমার কিডনিটা ভীষণ খারাপ, কোমরে বাত, ব্লাডে সুগার, পসট্রেট গ্ল্যাণ্ড অকেজো, নার্ভ—'

হাত তুলে মাঝ রাস্তায় তাঁকে থামিয়ে দিয়ে পরমেশ বলেছেন, 'আঃ। শরীরের কথাটা তুমি দেখছি কিছুতেই ভুলতে পারছ না। আমি তো বলেছিই যা ফিট-ইন করবে শরীর তাই মেনে নেবে।'

পুরনো এবং শেষ অস্ত্রটা তুলে নিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিলেন উমাপতি। বলেছিলেন, 'কিন্তু আমার স্ত্রী—'

'স্ত্রীর ফোবিয়া কোনকালেই তোমার যাবে না দেখছি।'

'কী করব বলো ভাই। শাদির পয়লা রাতে বেড়াল মারতে পারিনি। টাকাটা যদি বিয়ের আগে হাতে এসে যেত, কোন শালা বউকে পরোয়া করত? কিন্তু, কোয়ার্টার সেঞ্চুরি ধরে বউকে ভয় করে করে ব্যাপারটা মাথার ভেতর ফিক্সেসনের মতো আটকে গেছে।'

'জানি। তবে ভয়ের কিছু নেই। তোমার স্ত্রী যাতে টের না পান তার এ্যারেঞ্জমেণ্ট করা হবে। বুক ফুলিয়ে যখন করতে পারবে না তখন বেড়ালের মতো লুকিয়ে চুরিয়েই ফুর্তির কাপে চুমুক দাও।'

উমাপতি আর কিছু বলেননি। পরমেশ কারিৎকর্মা পুরুষ। তিনিই সাদার্ন এ্যাভেনিউর ফ্ল্যাটটার খোঁজ এনে উমাপতিকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন 'ফ্ল্যাটটা কেমন?'

কমপেনসেসন পাবার পর উমাপতি যে বাড়িটা কিনেছিলেন, এই ফ্ল্যাটটা তার চাইতে অনেক সুন্দর, অনেক ঝকঝকে। একটু অবাক হয়েই তিনি জানতে চেয়েছেন, 'এখানে নিয়ে এলে কেন?'

'আগে বল, পছন্দ হয়েছে কিনা?'

'পছন্দ না হবার কিছু নেই। যে দেখবে তারই ভালো লাগবে।'

'ব্যস, আমি নিশ্চিন্ত। তা হলে ওটা কিনে ফেল।'

'আমার নিজের অত বড় বাড়ি রয়েছে। খামোখা আরেকটা ফ্ল্যাট কিনতে যাব কেন?'

পরমেশ তাঁর কানের কাছে মুখ এনে গুজগুজিয়ে বলেছিলেন, 'মেয়েমানুষটিকে এখানে এনে রাখবে।'

উমাপতি হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, 'এখানে রাখব!'

'বাড়িতে নিয়ে যদি তুলতে চাও, ভালো কথা। তা হলে খরচ অনেক বেঁচে যাবে। তবে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে মেয়েমানুষটির কো-একজিসটেন্স কতটা হবে, সেটা ভাই তুমি বুঝবে।'

'কিন্তু—'

বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে পরমেশ অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো বলেছেন, 'আরে বাবা, এসব ব্যাপার লোকে বাইরে বাইরেই সারে।

আগেকার দিনের বড়লোকেরা বাগানবাড়িতে মেয়েছেলে পুষত। এখনকার কনভেনসন হচ্ছে বড় বড় এ্যাপার্টমেন্ট হাউসে মেয়ে রাখা। যে সময়ের যা।' একটু থেমে আবার বলেছেন, 'এই হাই-রাইজ বিল্ডিং-এ মেয়েমানুষ রাখলে তোমার বউ কেন, তার ফাদার, তার ফাদারও টের পাবে না। মাঝখান থেকে তোমার কাজটাও স্মুদলি হয়ে যাবে।'

ফ্ল্যাটটার দাম কত?'

'এক লাখ পঁচিশ। এমন 'পশ' লোকালিটিতে দামটা প্রায় কিছুই না। এটাকে তুমি বার্গেন প্রাইস বলতে পারো। এর ওপর ডেকরেসনের জন্য আর পঁচিশ হাজার। মেয়েটাকে তো তুমি ন্যাড়া একটা ফ্ল্যাটে এনে তুলতে পার না।'

পরমেশের অন্য কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলেন না উমাপতি। ফ্ল্যাটের দাম আর ডেকরেসনের খরচ মনে মনে জোড়া লাগিয়ে তিনি প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছেন, 'দেড় লাখ টাকা!'

পরমেশ বলেছেন, 'দেখ ভাই, তুমি এখন একজন মিলিওনেয়ার। তোমার যে একটা মিড্‌ল ক্লাস ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল সেটা কিছুতেই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছ না। মধ্যবিত্তদের মতো এত হিসাব করো না।'

'কিন্তু অতগুলো টাকা!'

'আবার হিসেব! অত প্রফিট অ্যান্ড লসের অংক কষে কেউ আনন্দ করতে নামে না।'

'তবু—'

পরমেশ এবার যা বলেছিলেন সংক্ষেপে এইরকম। একশো বছর আগে এই কলকাতা শহরের বাবুরা বিড়ালের বিয়ে কি বুলবুলির লড়াইতে হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে দিয়েছেন। নিলামে দাম চড়িয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে বাঈজী এনে বাগানবাড়িতে রেখে লাখ লাখ টাকা খরচ করেছেন। আর সামান্য দেড় লাখের জন্য একেবারে গলা শুকিয়ে মরে যাচ্ছেন উমাপতি। তাতে এ টাকাটা আবার নিজের রোজগারের নয়। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার জায়গায় পুরোপুরি আঠারো আনা। যদি কমপেনসেসনের টাকাটা

নাই পেতেন উমাপতি, তা হলে? আনন্দ করতে গিয়ে টাকা সম্পর্কে, অত এ্যাটাচমেন্ট ঠিক না।

সুতরাং ফ্ল্যাট কেনা হলে, ডেকরেসন করানো হলো। শেষ পর্যন্ত কারিৎকর্মা পরমেশ মন্মথকে কনট্যাক্ট করে দীপাকে যোগাড়ও করে ফেললেন। তার পর আজ পাঁজীতে শুভ দিনক্ষণ দেখে সেই দীপাকে সাদার্ন এ্যাভেনিউর নতুন ফ্ল্যাটে নিয়ে তুলেছেন উমাপতি।

এখন পর্যন্ত মোটামুটি এই হলো উমাপতি সমাদ্দারের বায়োগ্রাফি।

পাঁচ

সকালে ঘুম ভাঙার পর প্রথমটা দীপার মনে হলো স্বপ্ন দেখছে। এক ফুট পুরু ফোমের গদির ওপর শুয়ে তার চোখে পড়েছিল, গোটা ঘরটায় দামী সুদৃশ্য ওয়ার্ডরোব, ড্রেসিং টেবল, সবুজ রঙের টেলিফোন, রেডিওগ্রাম এবং সেটার ক্যাবিনেটের ওপর অনেকগুলো বিদেশী পুতুল ইত্যাদি ইত্যাদি চমৎকার করে সাজানো রয়েছে। হাওয়ায় দরজা এবং জানালার সাদা ধবধবে পর্দাগুলো উড়ছিল। ভেন্টিলেটরের ফাঁক দিয়ে সরু সরু সোনার সুতোর মতো নরম রোদ এসে পড়েছে। অবশ্য খোলা দরজা-জানালা দিয়েও প্রচুর রোদ এসেছে

চোখদুটো বারকয়েক রগড়ে নেবার পরও চারপাশের সেই সব দৃশ্যাবলীর এতটুকু হেরফের হলো না। দীপা বুঝতে পারছিল না, এখানে কেমন করে এলো। কয়েক সেকেন্ড মাত্র, তারপরই কাল রাত্তিরের যাবতীয় খুঁটিনাটি ঘটনা তার মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল, মা এবং ভাইবোনদের ছেড়ে এই প্রথম একটা রাত সে বাইরে কাটিয়েছে। যদিও উমাপতি সমাদ্দার কাল এখানে থাকেননি, সে একা একাই রাত কাটিয়েছে তবু গা-ঘিনঘিনে বমির মতো একটা ভাব গলার ভেতর থেকে ডেলা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে আসতে লাগল যেন। মনে হলো ম্যানহোলের ভেতর ঢুকে সারা শরীরে ময়লা মেখে

সে এইমাত্র উঠে এসেছে। নিজের মুখে হাজারবার থুতু ছিটোতে ইচ্ছা করছিল দীপার।

বেলা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। দরজা-জানালা বা ভেণ্টিলেটর দিয়ে ঘরে যে রোদ এসেছে ক্রমশ তার রঙ বদলে গেল। কিন্তু বিছানা থেকে উঠতেই ইচ্ছা করছে না দীপার। তার শরীরে এতটুকু শক্তি যেন আর অবশিষ্ট নেই। অসীম গ্লানি আর ক্লান্তি চারদিক থেকে চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে আছে।

শুয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ সোদপুরে তাদের পুরনো আমলের ধসেপড়া আস্তর-খসা একতলা বাড়ি, মা এবং ছোট ভাইবোনদের মনে পড়ে যাচ্ছিল।

দীপাদের পারিবারিক ইতিহাসে নতুনত্ব কিছুই নেই। কলকাতার আশেপাশে লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলিগুলোর যা অবস্থা ওদেরও ঠিক তাই। বাবা ছিল এক উকীলের মুহুরি। চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে তার। মুহুরিগিরির সামান্য রোজগারে এত বড় সংসার চালাতে লোকটার জিভ বেরিয়ে আসত। হাজার রকমের অভাব থাকলেও বাবা মানুষটা খুব খারাপ ছিল না। খুবই আমুদে টাইপের মানুষ। হৈ-হুল্লোড় করে বেঁচে থাকতে ভালবাসত। যেদিন দুটো পয়সা বেশি পকেটে এসে যেত দুম করে বাজার থেকে একজোড়া ইলিশ হাতে ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরত কিংবা কিনে আনত বেগম আখতারের গজল রেকর্ড। দীপাদের একটা রেকর্ড প্লেয়ার ছিল। যাই হোক বাবা যখন ইলিশ কিংবা রেকর্ড নিয়ে ফিরত ঘরে তখন হয়ত মশলা নেই, তেল নেই, চালও বাড়ন্ত। এই নিয়ে মা চিৎকার জুড়ে দিত। কিন্তু বাবা কখনও রাগ করতে জানতো না, মন খারাপ করতে জানতো না, মুখ তার কখনও বেজার হতো না। মায়ের চেঁচামেচির মধ্যেই মিষ্টি করে হেসে বাবা বলতেন, নেই তো কী, আজকের দিনটা ধারধোর করে চালিয়ে দাও।' ডিকেন্সের উপন্যাসের মিকোবর চরিত্রটির অবিকল কার্বন কপি ছিল বাবা।

বাবা বেশি লেখাপড়া করতে পারেনি। কিন্তু লেখাপড়ার দামটা সে জানতো আর জানতো ওটা না হলে মাথা তুলে দাঁড়ানো যায় না। তাই অভাব-টভাবের মধ্যেও ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে

পাঠিয়েছিল। এত টানাটানির ভেতর কি করে যে বাবা পড়ার খরচ চালাতো সে-ই জানে।

এইভাবেই চলছিল। আচমকা দশদিনের জ্বরে বাবা মারা গেল। হয়েছিল টাইফয়েড। ডায়াগনোসিসের ভুলে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। তখন ভাই-বোনদের মধ্যে সবার বড় দীপা সবে বি-এ পার্ট ওয়ান দিয়েছে।

এইসব ফ্যামিলিতে যা হয়ে থাকে, 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়'। ফলে একটা পয়সাও সঞ্চয় ছিল না।

বাবার মৃত্যুর পর প্রথম ক্যাজুয়ালটিটা যার ওপর দিয়ে গেল সেটা দীপাদের লেখাপড়া। ওটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। আত্মীয়-স্বজনরা অবশ্য সবাই এসেছিল। কিছুদিন—'আহা, উহু, সংসারটা ভেসে গেল,—ইত্যাদি ইত্যাদি চলল। এটুকু সহানুভূতির বেশি তাদের আর করারই বা কী ছিল। সবাব অবস্থা তো দীপাদের মতো—'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়—' অবশ্য তার মামাদের কথা না বললে খুবই অন্যায় করা হবে।

বাবা মারা গেলে মামারাই পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় বছর-খানেক ভাগ্নে-ভাগ্নী এবং বোনকে তারা টেনেছে। কিন্তু তাদের ক্ষমতা আর কতটুকু। তাদের সবারই সংসার ছেলেপুলে আছে। কাজেই বছরখানেক বাদে সংসার খরচ থেকে টাকা তুলে যে মাসো-হারা তারা পাঠাতো সেটা কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে আরেকটা ব্যাপার ঘটে গেছে। বাবার মৃত্যুর পর শোকটা সহ্য করতে পারেনি মা। তার মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে। দু-চারদিন হয়ত ভালো থাকে, তারপর একমাস কেমন যেন হয়ে যায়। কারো সঙ্গে কথা বলে না, খেতে চায় না, স্নান করতে চায় না। আপনমনে চুপচাপ হয়ত বসে থাকে, নইলে বিড় বিড় করে কথা বলে যায়। মনে হয়, বাবা যেন তার সামনে বসে আছে, আর মা তার সঙ্গে সংসারের যাবতীয় ব্যাপার, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে পরামর্শ বা ঝগড়া করছে।

মামাদের মাসিক গ্রান্ট বন্ধ হয়ে যাবার পর গোটা সংসারটা এসে পড়েছিল দীপার কাঁধে। প্রথম প্রথম দিনরাত টুইসান করেছে সে আর দশ দিন পনের দিন পর পর, ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে গা থেকে

রক্ত বেচে এসেছে। কিন্তু শরীরে কত আর রক্ত আছে যে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে বার বার বেচে আসা যায়। টুইসান আর রক্ত বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে আর ডালহৌসির অফিসপাড়ায় ঘুরে ঘুরে পায়ের গোড়ালি, ক্ষইয়ে ফেলেছে সে কিন্তু দুশো টাকার একটা চাকরিও যোগাড় করতে পারেনি।

দীপা যখন কোনদিকে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিল না সেই সময় মন্মথর সঙ্গে তার আলাপ। আলাপটা করিয়ে দিয়েছিল রাধা—সোদপুরেরই মেয়ে সে, দীপার সঙ্গে স্কুলে পড়ত। তবে কলেজের দরজা পর্যন্ত সে যেতে পারেনি। স্কুল ফাইনাল পাশ করার আগেই দীপার মতো তার বাবা মারা গিয়েছিল এবং দীপার মতোই তাদের সংসারের দায়িত্ব গিয়ে পড়েছিল রাধার ওপর। কিন্তু স্কুল ফাইনালটাও যে মেয়ে পাশ করতে পারেনি তার পক্ষে চাকরি পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই অনিবার্যভাবে মন্মথর সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল। মন্মথ তাকে নিয়ে গিয়েছিল কলকাতার হোটেলে হোটেলে। তারপর থেকে সন্ধ্যে হলেই সাজগোজ করে কলকাতায় চলে যায় রাধা, ফেরে পরের দিন সকালে।

দীপা যখন চাকরি চাকরি করে পাগলের মতো চারদিকে ছোটাছুটি করছে সেই সময় একদিন সকালে রাধার সঙ্গে সোদপুরের বাস স্ট্যাণ্ডে দেখা। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যাবার জন্য দীপা দাঁড়িয়েছিল। তার বাস আসার আগেই রাস্তার উল্টোদিকের স্ট্যাণ্ডে কলকাতার বাস এসে গিয়েছিল, আর সেটা থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে এ-পারে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল রাধা। দীপাকে দেখতে পেয়েছে সে।

দীপাও রাধাকে দেখতে পেয়েছিল। ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল তার, অস্বস্তির কারণও আছে। রোজ বিকেলে রাধা কেন কলকাতায় যায় গোটা সোদপুর তা জানে। এদিকের সবাই তাকে কুৎসিত কোন রোগের বীজাণুর মতো ঘেন্না করে এবং পারতপক্ষে তার সঙ্গে কথা বলে না। যদিও রাধা একসময় দীপার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত, দারুণ বন্ধুত্বও ছিল স্কুলে, কলকাতার হোটেলে রাত কাটাবার কথাটা শুনবার পর থেকে সে-ও রাধার সঙ্গে কথা বলত না। রাস্তায় মুখোমুখি হয়ে গেলে না-দেখার মতো অন্য দিকে তাকিয়ে

চলে যেত। রাধা সংসার বাঁচাবার জন্য যা-ই করুক, তার এক ধরনের আত্মসম্মান বোধ ছিল। কেউ তাকে এড়াতে চাইলে সে কখনো যেচে গায়ে পড়ে তার সঙ্গে কথা বলতে যেত না। সে-ও যেন দেখতে পায় নি, এইরকম একটা ভাব করে রাস্তার অন্য কোন দৃশ্য দেখতে দেখতে চলে যেত।

সেদিন কিন্তু রাধা চলে যায়নি, সোজা দীপার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। রাধার চোখদুটো সেই মুহূর্তে লালচে এবং ঘুম-জড়ানো। রুক্ষ চুল সিঁথির দু-পাশে উড়ছিল, ভাঙা খোঁপা ঘিরে চটকানো বাসি ফুল। চোয়াড়ে মুখে পেইন্ট চটে গিয়ে দাগড়া দাগড়া ছোপ পড়েছে, কালকের লিপস্টিক শুকিয়ে ঠোঁটদুটো কাঠের টুকরোর মতো দেখাচ্ছে। চোখের তলায় ভুষো কালির ছোপ। দেখেই বোঝা গিয়েছিল রাত্তিরে এক সেকেণ্ডও ঘুমোতে পারেনি মেয়েটা। কত রাত যে তার বিনাঘুমে জেগে জেগে কাটাতে হয়েছে তা-ই বা কে জানে।

রাধা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেমন আছিস দীপা ?'

যত সংক্ষেপে সম্ভব দীপা বলেছিল, 'ভালো।'

একটু চুপ করে থেকে রাধা বলেছে, 'সত্যি বলছিস না ; আমি জানি তুই ভালো নেই।'

দীপা রাস্তার দিকে ব্যস্তভাবে তাকিয়েছে। যদি কলকাতার বাসটা এসে পড়ত, সে বেঁচে যেত। কিন্তু অনেকদূর পর্যন্ত তাকিয়েও বাসের কোন চিহ্নই চোখে পড়েনি।

রাধা আবার বলেছে, 'এই সকালবেলা কোথায় চললি ?'

দীপা আগের মতোই বলেছে, 'কলকাতায়।'

রাধা বলেছে, 'এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে, তাই না ?'

দীপা বেশ অবাক হয়ে বলেছে, 'তুই কী করে জানলি ?'

'তুই আমাকে ঘেন্না করিস, আমাকে দেখলে এড়িয়ে যাস, তবু তুই আমার বন্ধু তো ছিলি। তোর সব খবর আমি জানি। মেসোমশায়ের মৃত্যুর পর অনেক বার ভেবেছি তোদের বাড়ি যাব। কিন্তু তোরা কী ভাববি, সেই ভয়ে যাইনি। আমি তো খারাপ মেয়ে।'

দীপা উত্তর দ্যায়নি।

রাধা একটু ভেবে এবার বলেছে, 'দেড় বছর ধরে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে ঘুরছিস। চাকরির ব্যবস্থা কিছু হলো?

দীপা হতাশভাবে মাথা নেড়েছে, 'না—'

রাধা বলেছে, 'পঞ্চাশ বছর ঘুরলেও কিছু হবে না। শুধু শুধু ঘোরা-ঘুরিই সার।'

দীপার বলার কিছু ছিল না। সে চুপ করে থেকেছে।

এই সময় কলকাতার বাস এসে গিয়েছিল। রাধা বলেছিল, 'উঠে পড়, আমি চলি। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

'আচ্ছা—'

'যদি আমাকে দিয়ে তোর কোন কাজ হয় বলিস—'

বাসে উঠতে উঠতে খানিকটা দ্বিধা করেই দীপা বলেছে, 'আচ্ছা—'

এরপর যখনই রাস্তায় দেখা-টেখা হয়েছে চাকরির কথা জিজ্ঞেস করেছে রাধা। দীপা জানিয়েছে, 'এখনও কিছুই হয়নি।'

রাধা বলেছে, 'তা হলে কী করে তোদের চলছে?'

তখন মাঝে মাঝেই দু-দিন তিনদিন করে উপোষ চলছিল দীপাদের। সে বলেছে, 'চলছে না ভাই।'

'চাকরির আশা তুই ছেড়ে দে দীপা। আমাদের মতো ফ্যামিলির মেয়েদের চাকরি হয় না। চাকরি পেতে হলে মালদার মেসো কি মামা চাই। আমাদের কি সে সব আছে?'

'তা হলে কী করব?'

'আমার জানাশোনা এক ভদ্রলোক আছে। তুই যদি চাস তার কাছে তোকে ইনট্রোডিউস করে দিতে পারি। ভদ্রলোক অনেক জায়গায় ঘোরে, নানারকম লোকের সঙ্গে আলাপ আছে। একটা কিছু ব্যবস্থা তোর নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।'

দীপা তখন আর কিছু ভাবতে পারছিল না। সে বলেছে, 'তুই যা ভালো বুঝিস, কর।'

রাধা একদিন তাকে কলকাতার এক রেস্তোরাঁয় নিয়ে মন্মথর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। পর্দাঢাকা কেবিনের ভেতর বসে নিজের সব কথা বলে গিয়েছিল দীপা।

ফিলজফারের মতো মুখ করে মন্মথ সব শুনে গেছে। তারপর

বলেছে, 'আজকাল অনেক ফ্যামিলিতে এরকম ঘটেছে। নাথিং নিউ। আমি তোমার জন্য কী করতে পারি বল।'

রাধা বলেছে, 'দীপার একটা চাকরির ব্যবস্থা যদি করে দ্যান মন্মথদা—'

মন্মথর মধ্যে কোনরকম লুকোচুরি বা ডিপ্লোম্যাসি নেই। সে যা বলতে চায় সোজাসুজি স্পষ্টাস্পষ্টিই বলে ফেলে। মন্মথ জানিয়েছিল মেয়েদের একটি কাজই সে যোগাড় করে দিতে পারে। সেটা এইরকম। পুরুষদের এণ্টারটেনমেণ্টের জন্য মেয়ে দরকার। দীপা যদি রাজী থাকে, সেরকম একটা কাজের বন্দোবস্ত সে করে দেবে।

দীপার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। সে দম-আটকানো মানুষের মতো বলেছে, 'না-না, আমি পারব না।'

অভিজ্ঞ ঝানু মন্মথ খানিকক্ষণ দীপার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে করে বলেছে, 'তুমি যা ভেবেছ, আমি বোধহয় বুঝতে পেরেছি। কোন পুরুষের সঙ্গে তুমি রাত কাটাতে চাও না—এই তো?'

দীপা মুখ নামিয়ে মাথা নেড়েছে।

মন্মথ এবার বলেছে, 'এণ্টারটেনমেণ্টের অনেক রকম ক্লাসিফিকেসন আছে। রাত কাটাবার তো দরকার নেই। তবে—'

দীপা মুখ না তুলেই ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'তবে কী?'

'অন্যরকম এণ্টারটেনমেণ্টও কী কম।'

'অন্যরকম বলতে?'

'এই ধরো, কলকাতায় হাজার হাজার ফরেনার আসছে। তুমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলে, লাঞ্চ বা ডিনার টেবলে বসে কম্পানি দিলে—এই আর কি।'

দীপা বলেছিল, 'আমি রাজী।'

'ইংরেজি বলতে পারো?'

'বলার তো অভ্যেস নেই। তবে কাজ চালিয়ে নিতে পারব বলে মনে হয়।'

স্পোকেন ইংলিশের দু-চারটে লেসন তখনই দীপাকে শিখিয়ে দিয়ে সেদিনই সন্ধ্যায় একদল ফ্রেঞ্চ টুরিস্টের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিল মন্মথ। ঠিক হয়েছিল দীপা যা পাবে তার থেকে

প্রতিটি যোগাযোগের জন্য ফাইভ পারসেণ্ট মন্মথকে কমিশন দেবে।
সেই শুরু। মাস কয়েক এইভাবে চলল। কিন্তু শরীর বাঁচিয়ে বিদেশীদের সঙ্গ দেবার জন্য মন্মথ বা তার মতো আরো অনেকের হাতে গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে রয়েছে। এ লাইনেও দারুণ কম্পিটিসন। একবার টুরিস্টদের সঙ্গ দেবার পর দ্বিতীয় সুযোগ আসতে বেশ কিছুদিন কেটে যায়। এদিকে টুরিস্টরা এণ্টারটেনমেণ্ট ফী যা দ্যায় তাতে অতদিন সংসার চলে না। শেষ পর্যন্ত মন্মথর সঙ্গে দেখা করে দীপা বলেছিল, 'আমি আর.চালাতে পারছি না।'
মন্মথ বলেছিল, 'আমি কী করব বল। শরীর বাঁচাতে গেলে এর বেশি আমার পক্ষে তোমার জন্য কিছু করা সম্ভব নয়।'
দীপা বলেছিল, 'আমি আর ভাবতে পারছি না। আপনি যা ভালো বোঝেন করুন।'
মন্মথ একটু ভেবে বলেছিল, 'এণ্টারটেনমেন্টের ব্যাপারে যেটা সব চাইতে রেসপেক্টেবল আমি তোমার জন্য তাই করব। অন্য মেয়েদের মতো রোজ রোজ হোটেলে গিয়ে তোমাকে রাত কাটাতে হবে না।'
এরপরই মন্মথ তার সঙ্গে উমাপতি সমাদ্দারের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে এবং একটি রাত ভাইবোন আর মাকে ছেড়ে সাদার্ন এ্যাভেনিউর এই ফ্ল্যাটে তার কেটে গেল।

কতক্ষণ চুপচাপ শুয়ে ছিল, খেয়াল নেই। আচমকা কলিং বেল বেজে উঠল। আওয়াজটা ভারি মিষ্টি। অনেকটা পিয়ানোর টুং টাং শব্দের মতো। দীপা ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ভাবতে চেষ্টা করল, এই সকালবেলায় কে আসতে পারে। পরক্ষণেই তার মনে পড়ল, উমাপতি কাল বলেছিলেন আজ সকালে এখানকার কাজ-কর্মের জন্য একটা মেইড সারভেণ্ট আসবে। খুব সম্ভব সে-ই এসেছে।
খাট থেকে নেমে পর পর তিনখানা বেডরুম, সিটিং রুম-কাম-ডাইনিং রুম পার হয়ে বাইরের দিকের দরজার কাছে চলে এলো দীপা। ছিটকিনি খুলতে গিয়ে হঠাৎ উমাপতির আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল। দরজায় কাচ-লাগানো যে ফুটো রয়েছে, ছিটকিনি

খোলার আগে সেখানে চোখ রাখতে বলেছেন উমাপতি। যে কলিং বেল বাজাবে তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলে তবেই যেন দীপা দরজা খোলে।

দীপা ছোট গোল কাচের ওপর চোখ রাখল এবং অবাক হয়ে দেখল বাইরের করিডরে যে দাঁড়িয়ে আছে সে মেয়েমানুষ না। ট্রাউজার শার্ট ইত্যাদি ছাড়া তার মুখটুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে সে একজন পুরুষ সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তার মানে মেইড সারভেন্টটা আসেনি।

কিন্তু কে হতে পারে। দীপা কোমর বাঁকিয়ে অনেকখানি নীচু হয়ে চোখদুটো সেই গোল কাচের এধার থেকে ওধারে নিয়ে বার বার দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু বাইরের লোকটি এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না।

তবে কি উমাপতিই এই সকালবেলা চলে এসেছেন ? দেড় লাখ টাকা খরচ করে এই ফ্ল্যাট কিনে সাজিয়েছেন, দীপাকে এনে তুলেছেন, অথচ কাল এখানে রাত কাটিয়ে যেতে পারেন নি। তার ক্ষতিপূরণ করার জন্যই কি আজ সকাল হতে না হতে দৌড়ে এসেছেন ? অদ্ভুত এক ভয় আচমকা দীপার দম বন্ধ করে আসতে লাগলো।

এদিকে বাইরের লোকটি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। আবার সে বেল টিপল, পিয়ানোর শব্দ টুংটাং করে গোটা ফ্ল্যাটের বাতাসে ঢেউ তুলে যেতে লাগলো।

আরো কয়েক সেকেণ্ড কাচে চোখ রেখে আচমকা দীপার মনে হলো বাইরের লোকটি উমাপতি না, তাঁর পোশাক এত 'মড' নয়। তা ছাড়া শরীরও থলথলে, এখানে ওখানে প্রচুর চর্বির থাক। কিন্তু করিডরে যে দাঁড়িয়ে আছে তার হাত-পা বা আঙুল দেখে সনাক্ত করা যায়, সে একজন যুবক।

উমাপতি যদিও বলেছেন দিনের বেলাতেও বুঝেসুঝে দরজা খুলতে, তবু কি ভেবে ছিটকিনিটা সে টেনে দিল। তারপর আস্তে দরজার পাল্লা টানতেই অবাক হয়ে গেল। করিডরে পাশের ফ্ল্যাটের সেই যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে। দীপা কিছু বলার আগেই সে বলে উঠল, 'কালকের ব্যবহারের জন্য আমি খুব দুঃখিত। একটা ব্যাপারে ভীষণ এক্সাইটেড ছিলাম, সেই সময় ঐ মিডল-এজেড

ভদ্রলোক আমাকে ডেকে আপনার কথা বললেন। বিলিভ মী, তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না।' একটু থেমে বলল, 'প্লিজ, কিছু মনে করবেন না।'

যে তার আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তাকে কী আর বলা যায়। তা ছাড়া উমাপতি সমাদ্দারের অনুরোধে দীপার ওপর তাকে নজর রাখতে হবে, এমন কোন কথাও নেই। দীপা আস্তে করে জানালো, সে কিছু মনে করছে না।

ছেলেটি বলল, 'কাল রাতে আপনার কোন অসুবিধা হয় নি তো?'

কাল এই ছেলেটিকে ভয়ানক রূঢ় আর চোয়াড়ে ধরনের মনে হয়েছিল। আজ সে খুবই ভদ্র বিনয়ী এবং সহানুভূতিশীল। দীপা তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না।'

ছেলেটি এবার জিজ্ঞেস করলো, 'কালকের ঐ ভদ্রলোকটি নিশ্চয়ই আপনার কোন আত্মীয়-টাত্মীয় হবেন। আই মীন—বাবা, কাকা এইরকম কেউ—'

দীপা বুঝতে পারলো, ছেলেটি উমাপতির কথা বলছে। পলকে তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা ফিক ব্যথা অনুভব করতে লাগলো সে। আবছা দুর্বল গলায় কোনরকমে বলল, 'আত্মীয়, মানে—'

ছেলেটি দীপার মুখচোখের দিকে লক্ষ্য করেনি। তার উত্তরটাও ভালো করে না শুনে আবার জিজ্ঞেস করল, 'উনি কি আজ এসেছেন?'

ছেলেটি উমাপতি সম্পর্কে কী জানতে চায়, বুঝতে না পেরে দীপা একটু দ্বিধা করলো। তারপর বলল, 'না—'

'তা হলে এখনও আপনি একলাই আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'যদি কোন দরকার হয় আমাকে ডাকবেন।'

দীপা আস্তে মাথা নাড়লো।

ছেলেটি তাদের ফ্ল্যাটের দিকে দু'পা গিয়েই ঘুরে দাঁড়ালো। বলল, 'ঐ দেখুন আলাপ-টালাপ হলো কিন্তু কেউ কারো নাম জানি না। আমি রজত—'

দীপা তার নাম বলল।

রজত বলল, 'ফাইন। আবার দেখা হবে।' বলে আর দাঁড়ালো না, তাদের ফ্ল্যাটে চলে গেলো।

এদিকে দরজা বন্ধ করে ভেতরে যেতে যেতে দীপার খেয়াল হলো, এখনও মুখটুখ ধোয়া হয়নি। সে আর বেডরুমে গেল না, সোজা সামনের একটা বাথরুমে ঢুকে পড়লো।

মুখ ধুয়ে দীপা যখন বেরিয়েছে, পিয়ানোর শব্দ তুলে আবার কলিং বেল বাজলো। অগত্যা ঘরে আর যাওয়া হলো না, দীপা বাইরের দরজার কাছে এসে গোল কাচে চোখ রাখলো। করিডরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স টয়স অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। সকালে, মেইড সারভ্যাণ্টের আসার কথা আছে ; খুব সম্ভব সে-ই। দীপা দরজা খুলে দিল।

করিডরের মেয়েটিকে এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাকে ঠিক মেয়ে বলা যায় না। মেয়েমানুষ বললেই মানায়। বয়স বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। গায়ের রঙ সাঁওতালদের মতো কালো, প্রচুর স্বাস্থ্য, মাথায় আদিবাসীদের মতো উঁচু করে খোঁপা বাঁধা। খোঁপাটার চারধারে সন্ধ্যামালতীর ফুল বসানো। গোল মুখে ছোট ছোট চোখ ; তাতে গুচ্ছের কাজল লাগানো রয়েছে। দুই ভুরুর মাঝখানে বরফির মতো সবুজ টিপ। দুই পুরু ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, নিচের ঠোঁটের তলায় নকল একটা তিল। মেয়েটা উঁচু কপালী, মাথায় জবজবে করে সস্তাদামের গন্ধ তেল মাখানো রয়েছে। পরনে জ্যালজেলে নাইলেক্স শাড়ি ; ভেতরকার ক্যাটকেটে লাল সাটিনের সায়া ফুটে বেরুচ্ছে। গায়েও টকটকে লাল ব্লাউজ। পায়ে সস্তা দামের ছ'ইঞ্চি হিলের জুতো। সারা গায়ে গিল্টি-করা জবড়জঙ সব গয়না। চোখে কম দামের গগল্‌স্‌। কাঁধ থেকে প্ল্যাস্টিকের একটা ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলছে। আরেক হাতে কাপড়ের বড় থলেতে জামা-কাপড় ঠাসা। ঘাড়ে এবং গলায় এক ইঞ্চি পুরু পাউডার, শাড়ি থেকে উগ্র সেন্টের গন্ধ উঠে আসছিল।

মেয়েমানুষটি হাত জোর করে বলল, 'আপনি দীপা দিদিমণি তো ?'

দীপা মাথা নাড়লো, 'হ্যাঁ।'

'আমার নাম কামিনী। উমাপতিবাবু আজ সকালে এখানে আসতে কয়েচে।'

মেইড-সারভ্যাণ্টকে ঠিক এইরকম সাজসজ্জায় দেখবে দীপা ভাবতে পারেনি। 'তুমি' বলবে, না 'আপনি'—প্রথমটা সে ঠিক করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত দ্বিধার ভঙ্গিতে আস্তে করে বলল, 'এসো—'

কামিনী ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিল দীপা। তার সঙ্গে ভেতরে যেতে যেতে কামিনী বলল, 'এখন থেকে আমি আপনার কাছে রইব। সব কাজকম্মো করবো। উমাপতিবাবু আপনার দেখা-শোনার সব ভার আমার ওপর দিয়েচে।'

দীপা উত্তর দিল না।

ওরা ডাইনিং-কাম-সিটিং রুমে এসে পড়ল। কামিনী হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বলল, 'কাজকম্মো শুরু করার আগে আপনার সঙ্গে কিছু কথা আচে।'

দীপা জিজ্ঞাসা করলো, 'কী কথা?'

'কইচি। তার আগে ফেলাটখানা (ফ্ল্যাটখানা) এট্টুস ঘুরে দেখে লিই।'

দীপার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সবগুলো বেডরুম, কিচেন, স্টোর, রাস্তার দিকের ব্যালকনি দেখলো কামিনী। তারপর আবার ডাইনিং-কাম সিটিং রুমে ফিরে এসে বলল, 'মোন্দ লয়। তবে এর আগে থেটোর (থিয়েটার) রোডে যে গুজরাটীবাবুর কাছে কাজ করেচি তার ফেলাট (ফ্ল্যাট) এর 'ডবল'। তার আগে আলিপুরে যে পার্শী সাহেবের কাছে কাজ করেছি তার ফেলাটটা তিন ডবল। যাক গে, কাপড়টা ছেড়ে লিই—' দীপার সামনেই নাইলেক্সের শাড়ি ছেড়ে একটা সস্তা প্রিন্টেড শাড়ি গাছকোমর করে পরে নিল সে। তারপর বলল, 'বসুন দিদিমণি—' বলেই একটা সোফায় গা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, এই ফ্ল্যাটটা যেন কামিনীরই। দীপা কিছু না বলে তার মুখোমুখি অন্য একটা সোফায় বসল।

কামিনী বলল, 'উমাপতিবাবু কয়েচে সব্বোক্ষণ এই ফেলাটে আপনার কাছে থাকতে। কিন্তুন—'

দীপা জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু কী ?,

ফিক করে নতুন লাজুক বউটির মতো হেসে কামিনী বলল, 'আমার একজন লাভার আছে—'

দীপা চমকে উঠল, 'কী আছে ?

'লাভার গো লাভার, ভালবাসার মানুষ।'

দীপা বুঝতে পারল, নানা জাতের লোকের বাড়ি কাজ করে কিছু কিছু ইংরেজি বুলি শিখে ফেলেছে কামিনী। কোন কথা না বলে কামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

কামিনী আবার বলল, 'রোজ বিকেলে লাভারের সঙ্গে হাওয়া খাবার জন্যে দু'ঘণ্টা ছুটি দিতে হবে কিন্তুন। হপ্তায় একদিন আমরা বাইস্কোপ দেখি, সিদিন চার ঘণ্টা ছুটি দেবেন।'

দীপা এবারও উত্তর দিল না, আসলে কী বলা উচিত সে বুঝে উঠতে পারছিল না।

কামিনী কিন্তু সমানে বলে যাচ্ছিল, 'সাজতে গুজতে আমি খুব ভালবাসি। আপনার পাউডার, কিরিম (ক্রীম), ঠোঁটের রঙ, নোখের রঙ লাগাবো কিন্তুন—'

দীপা চুপ করে থাকল।

'কামিনী একটু ভেবে এবার বলল, বেরেকফাস্ট (ব্রেকফাস্ট) করেছেন দিদিমণি ?'

এতক্ষণে দীপার মনে পড়ল, ঘুম থেকে ওঠার পর তার কিছুই খাওয়া হয়নি। আস্তে মাথা নাড়ল সে, 'না—'

'আমিও কিছু খেয়ে আসিনি। ঘরে ডিম-মাখন রুটি-টুটি আছে তো ? আমার আবার টোস-ডিম ছাড়া সকালের খাওয়া হয় না।'

'সব আছে।'

'উমাপতিবাবুর হুঁশ আছে দেখছি। জানেন দিদিমণি, একবার এক সিন্ধীর বাঁধা মেয়েছেলের কাছে কাজ করেছিলুম। মুখপোড়া মেয়েমানুষ পুষেচে কিন্তুন পেথম দিন গিয়ে দেখি খাওয়াদাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই, সে যে কী ঝঞ্ঝাট। উমাপতিবাবু লোক ভালো মনে হচ্ছে। মেয়েমানুষ রেখে তার খাওয়ার কথা ভোলে নি।'

'মেয়েমানুষ' কথাটা দীপার কানে ছুঁচের মতো বিঁধে গেল।

এই ফ্ল্যাটে তার কী স্ট্যাটাস সেটা জেনেবুঝেই এসেছে কামিনী কিন্তু এত স্পষ্ট করে কথাটা সে মুখের ওপর উচ্চারণ করে বসবে, এতটা ভাবতে পারে নি। হয়ত ইচ্ছা করে কষ্ট দেবার জন্য বলেনি, কথায় কথায় মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবু দীপার মনে হলো, তার বুকের ভেতর শ্বাস আটকে আসছে।

কামিনী উঠে পড়ল, 'যাই, কিচিন থেকে বেরেকফাস্টটা করে আনি—' বলে হেলেদুলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

ছয়

এখন দশটার মতো বাজে। উমাপতি তাঁর তেতলার বেডরুমে খাটের দেড় ফুট পুরু ফোমের গদির ভেতর শুয়ে ছিলেন। চার-পাশে দামী দামী কভার দেওয়া নানা আকারের অনেকগুলো মাথার বালিশ, পাশ বালিশ আর তাকিয়া। মাথার বালিশের কাছে নানা মতের তিন চারখানা পঞ্জিকা পড়ে রয়েছে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গোটাকয়েক হট ওয়াটার ব্যাগ তাঁর কোমরে এবং পিঠে নাইলনের সুতো দিয়ে বাঁধা রয়েছে। কাল রাতে 'রু মুন ক্লাব' থেকে দীপাকে সাদার্ন এ্যাভেনিউর ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবার সময় সেই যে কোমরে আর শিরদাঁড়ায় খিঁচ ব্যথাটা হঠাৎ লেগে গিয়েছিল সেটা একটুও কমে নি, বরং বেড়েই গেছে। সারা রাত গরম জলের সেঁক চলেছে এবং এখনও চলছে। মাঝে মধ্যেই তিনি 'আঃ' 'উঃ' করে কাতরে উঠছেন।

উমাপতির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এখন গোটা ঘরখানার দিকে চোখ ফেরানো যেতে পারে।

ঘরটা প্রকাণ্ড, পঁচিশ বাই আঠারো ফুট। টাইলস বসানো মেঝেতে কার্পেট পাতা। ডিসটেম্পার-করা দেওয়াল। সীলিং থেকে দামী আলোর ঝাড় ঝুলছে। গোটা বেডরুমটা জুড়ে কত যে দামী দামী জিনিস তার হিসেব নেই। রেডিওগ্রাম, টিভি, ওয়ার্ডরোব, আলমারি, ডিভান, সোফা, সোফা-কাম-বেড—সব কিছু স্তূপাকার হয়ে আছে। শুধু এই ঘরটাই নয়, গোটা বাড়ির সবগুলো ঘরেরই

এক চেহারা, মালপত্রে ঠাসা। দুম করে কয়েক লাখ টাকা হাতে এসে যাওয়ার চোখের সামনে যা-যা দেখছেন সব কিনে ফেলেছেন উমাপতি। তাঁর বাড়িটাকে নানা জিনিসের এক্‌জিবিসন সেণ্টার বা গো-ডাউন বলা যেতে পারে।

উমাপতির তেতলার এই বেডরুমটার দক্ষিণ দিক একেবারে খোলা। সেখানে বড় একটা ব্যালকনি। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে বজবজের দিকের ট্রেন লাইন, তার ওপারে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে টালিগঞ্জের উঁচুনীচু বাড়ি এবং বস্তির একটা পেন্সিল স্কেচ চোখে পড়ে।

এই মুহূর্তে মেঝের ওপর প্রায় তিরিশ স্কোয়ার ফুট জায়গা জুড়ে উমাপতির স্ত্রী প্রভাবতী বসে আছে। দিন কয়েক আগে তাদের বিবাহ বার্ষিকীর সিলভার জুবিলী উপলক্ষে প্রচুর আত্মীয় এসেছিল। সেই সঙ্গে বড় মেয়ে, জামাই এবং দুই নাতি-নাতনীও। আত্মীয়-স্বজনরা সেদিনই খেয়েদেয়ে চলে গেছে। তবে মেয়ে-জামাই এখনও আছে। টাকা-পয়সা হওয়ার পর মেয়ে-জামাই কোন ছুতোয় একবার এলে এক মাসের আগে নড়ে না।

এখন নাতনীটা মেঝেতে শুয়ে প্রভাবতীর কোলের ওপর দুই পা তুলে রেখেছে। নাতিটা বড়, প্রভাবতীর পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড পিঠে চর্বির থাকে থাকে পা ঢুকিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছিল, কিন্তু প্রভাবতী বোধহয় টের পাচ্ছিল না। তার চর্বির স্তর এত পুরু যে গাঁইতি-টাঁইতি বা তুরপুন চালিয়ে ইঞ্চি তিনেক ফুটো করতে না পারলে খুব সম্ভব কিছু অনুভব করতে পারে না।

এই মুহূর্তে প্রভাবতীর সামনে মেঝের ওপর অগুনতি ফোটো, খানকতক এ্যালবাম আর আঠার শিশি পড়ে রয়েছে। জামাই এবং ছেলেমেয়েরা মাকে ঘিরে বসে আছে।

ক'দিন আগে উমাপতি এবং প্রভাবতীর যে রজতজয়ন্তী বিবাহ বার্ষিকী গেল সেই উপলক্ষে ঐ ফোটোগুলো তোলা হয়েছিল। বেশির ভাগ ফোটোই ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর। প্রভাবতী এবং উমাপতির আলাদা আলাদা কিছু ছবি তোলা হয়েছে। এ ছাড়া আত্মীয়স্বজন এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিছু গ্রুপ ফোটোগ্রাফও।

সিলভার জুবিলিতে মেয়েরা প্রভাবতীকে একেবারে বিয়ের সাজে সাজিয়েছিল। পরনে জরির কাজ-করা দু-হাজার টাকা দামের লাল বেনারসী, গলায় হীরের চিক এবং দশ ভরি সোনার সীতা হার, মাথায় মুক্তোর টায়রা, সিঁথিতে পান্না-বসানো টিকলি, হাতে গোছা গোছা সোনার চুড়ি, আঙুলে চুনী আর হীরের আঙটি, কানে ঝুমকো, নাকে নাকফুল। সারা মুখে সুন্দর করে চন্দনের নক্‌শা আঁকা হয়েছে। সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর, কপালে চন্দনের ফোঁটার ভেতর গোল সিঁদুরের টিপ, চোখে লম্বা করে কাজলের টান। খোঁপায় সোনার কাঁটা আর সোনার চিরুনির সঙ্গে ফুল গোঁজা রয়েছে, গলাতেও যুঁইফুলের মোটা মালা।

জামাই এবং ছেলেমেয়েরা একেকটা ফোটো প্রভাবতীর হাতে তুলে দিচ্ছিল আর বলছিল, 'দেখ, দেখ মা, তোমাকে আর বাবাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে!' জামাই সন্তোষ ছেলেমেয়েদের দেখাদেখি প্রভাবতী এবং উমাপতিকে 'তুমি' ক'রে বলে। প্রভাবতীই বলতে শিখিয়েছেন। জামাই আর ছেলেমেয়েতে কী-ই বা তফাত। জামাইকে এরা 'তুমি' বলে না, ছেলেমেয়েদের মতো 'তুই' করে বলে।

ফোটোগুলো হাতে নিয়ে লাজুক নতুন বউটির মতো হাসছিল প্রভাবতী আর বলছিল, 'তোদের যে কী কাণ্ড, বাপু বুঝতে পারি না। এমন করে বুড়ো বয়েসে কাউকে কনে বউ সাজায়। লজ্জায় মরি।' মুখে যা-ই বলুক, সাজটাজের জন্য তার চোখমুখ থেকে যে খুশি আর গর্ব উপচে পড়ছিল সেটা এক পলক তাকালেই টের পাওয়া যায়।

বড় মেয়ে শেফালী বলল, 'এমন একটা দিনে সাজাবো না। তোমাদের বিয়ের সময় কি এমন সাজতে পেরেছিলে?'

প্রভাবতী বলল, 'কোত্থেকে সাজবো! গরীবের ঘরের মেয়ে, পড়েছিলাম গরীবের ঘরে। তোর বাবা তখন মাছিমারা কেরানী।'

সেজো মেয়ে চামেলী বলল, 'তখন টাকা ছিল না, সাধ মেটাতে পারো নি। এখন মিটিয়ে নাও।'

'তা যা বলেছিস। কিন্তু তিন কাল যে চলে গেছে। সাধ-আহ্লাদের বয়েসে যদি তোর বাবার হাতে টাকাগুলো আসত!'

জামাই সন্তোষ বলল, 'সাধ মেটাবে, তার আবার বয়স কী। টাকা যখন লেট করে এসেছে, সাধটাও লেট করে মেটাও। না মেটালে আপসোস থেকে যাবে।'

হঠাৎ কী মনে পড়তে প্রভাবতী বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই মুখপোড়া যুধিষ্ঠির—'

যুধিষ্ঠির এ বাড়ির রাঁধুনী বামুন। রান্নাঘরটা একতলায়। সেখান থেকে ছুঁচোর মত সরু গলায় চিকচিকিনি আওয়াজ উঠে এল, 'কী বলছেন মা জননী—'

'পাজী বদমাইস, হাতা-খুন্তি নামিয়ে রেখে গাঁজায় দম দিচ্ছ?'

'না মা জননী, আমি তো রাঁধছি। ভাত নামিয়ে ছ্যাঁচড়া নামিয়ে এখন ডালে ফোড়ন দিচ্ছি—' যুধিষ্ঠিরের কথা শেষ হতে না হতেই ডালে সম্বরা দেবার উগ্র গন্ধ এবং শব্দ ভেসে এল।

'কালিয়ার মাছ ষাটখানা আছে তো?'

'আছে মা জননী।'

'প্রত্যেকটা টুকরো তিন ইঞ্চি করে?'

হ্যাঁ মা জননী।'

'রান্নার পর যদি দেখি টুকরো ছোট হয়ে গেছে, তোমার মাংস খুলে কালিয়া বানাবো। মনে থাকে যেন, আমি মাছ মেপে নেব।'

'মনে থাকবে মা জননী।'

'ডালের পর ছ্যাঁচড়া রেঁধে, কালিয়া রাঁধবি। তারপর চুনো মাছের ঝাল, তারপর পাঁঠার মাংস, তারপর মুরগির মাংস রেঁধে চাটনি বসাবি।'

'বসাবো।'

'কাল রাত্তিরে দই পেতে রেখেছিলি?'

'রেখেছি।'

'সাড়ে বারোটার সময় সবাই খেতে যাবে। তার ভেতর সব হয়ে যাওয়া চাই।'

'হবে মা জননী—'

'আরেকটা কথা শুনে রাখ, কাল রাত থেকে বাবুর বাতের ব্যথা চাগিয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে জ্বর। আজ আর তার জন্যে

রুটি, সুপ-টুপ করতে হবে না। রান্না হয়ে গেলে গ্যাসের উনুনে বার্লি বসিয়ে রাখিস।'

খানিকটা দূরে খাটের ওপর উমাপতি গোঙানির মতো কাতর শব্দ করলেন। কেউ তাঁর দিকে ফিরেও তাকালো না।

যুধিষ্ঠিরকে ছেড়ে এরপর গলাটাকে তিন পর্দা উঁচুতে তুলে চিৎকার করে উঠল প্রভাবতী, অ্যাই হিমি—'

একতলা থেকে তিরিশ ফুট বাতাসের স্তর ভেদ করে বেলো-ফাঁসা হারমোনিয়ামের মতো একটা শব্দ ভেসে এলে, 'কী কইচ গো মা—'

'রাজরানীর বাসনকোসন মাজা হয়েছে ?'

'এই হল।'

'এবার দয়া করে ঘরটরগুলো সাফ করো। গতরখানা একটু তাড়াতাড়ি নাড়ো—'

'নাড়ছি মা।'

হিমির পর একগাদা চাকর-বাকরকে ডেকে ডেকে ধমকাল প্রভাবতী। কে কী করছে তার খবর নিল, কে কী করবে বলে দিল। তেতলার এই কনট্রোল রুমে বসে গোটা বাড়িটাকে পায়ের বুড়ো আঙুলের তলায় রেখে দিয়েছে সে।

এতগুলো লোকের সঙ্গে পর পর ডুয়েট চালিয়ে আবার ফোটো দেখায় মন দিল প্রভাবতী।

সন্তোষ বলল, 'আমি একটা কথা ভেবেছি মা—'

প্রভাবতী ফোটো থেকে মুখ তুলে জামাইয়ের দিকে তাকাল, 'কী ?'

আগে থেকেই শ্বশুর-শাশুড়ীর চারখানা ফোটো বেছে আলাদা করে রেখেছিল সন্তোষ। সেগুলো প্রভাবতীর হাতে দিতে দিতে বলল, 'এই ফোটোগুলো আমরা খবরের কাগজে ছাপাবো—'

'কী লজ্জা! খবরের কাগজে ছাপাবি কি রে—'

'বড়লোকদের ম্যারেজ-এ্যানিভার্সারির ছবি খবরের কাগজে বেরোয়। দ্যাখো নি ?'

বাঘের মতো মেজাজ হলে কী হবে, ছবির ব্যাপারে প্রভাবতীর দুর্বলতা আছে। ছেলেমেয়েরা তা জানে। প্রভাবতী কিছু বলার আগেই তারা একসঙ্গে তাকে ছেঁকে ধরল, 'হ্যাঁ মা, ছাপতেই হবে, ছাপতেই হবে।'

লাজ্বক হেসে প্রভাবতী বলল, 'তোদের নিয়ে আর পারা যায় না। এই বয়সে কনে-বউ সাজিয়েছিস, তারপর আমার ছবি ছাপতে চাইছিস খবরের কাগজে! দেখিস, লোকে কী বলে।'

সন্তোষ বলল, 'লোকে বলবে এদের মতো হ্যাপি কাপ্‌ল্‌ আর নেই। এই বয়সে বিবাহ-বার্ষিকী করে যারা ছবি ছাপাতে দ্যায় তারা রিয়েল সুখী। দেখো ছবিগুলো বেরুবার পর কত লোক তোমাদের চিঠি দ্যায়। অনেকে প্রসেসন করে চলেও আসবে—'

ভুরু কুঁচকে প্রভাবতী জিজ্ঞেস করল, 'কেন রে?'

'কী করে এতগুলো বছর হ্যাপি ম্যারেড লাইফ কাটালে তার সিক্রেট জানতে।'

প্রভাবতী ভালো ইংরেজী জানে না। তবে সন্তোষের হাবেভাবে ব্যাপারটা বুঝে চড় মারার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে বলল, 'পাজীটা, আমরা না তোর শ্বশুর-শাশুড়ী।'

সন্তোষ হাসতে লাগল। তারপর বলল, 'ছবিগুলো ছাপতে দু হাজার টাকা লাগবে—'

প্রভাবতী ঠোঁট দুটো ছুঁচলো আর চোখ দুটো গোল করে বলল, 'দু হাজার! এত টাকা!'

বড় ছেলে মনোজ বলল, 'ছবিগুলো বেরুলে কিরকম আনন্দ হবে, একবার ভাবো তো। তার জন্যে ঐ ক'টা টাকা খরচ করবে না? বা রে—'

প্রভাবতীর ইচ্ছাটা ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনাই রয়েছে। তবু চোখেমুখে নকল বিরক্তি ফুটিয়ে বলল, 'তোদের নিয়ে আর পারি না'।

এবার উমাপতি সমাদ্দারের দিকে চোখ ফেরানো যাক। আগেই বলা হয়েছে, কোমরে এবং পিঠে গোটা কয়েক হট ওয়াটার ব্যাগ বেঁধে তিনি শুয়ে আছেন আর একেক বার সেই খিঁচ ব্যথায় কাতর শব্দ করে উঠছেন। তাঁর একদিকে এক গাদা পঞ্জিকা, আরেক দিকে একটা মেরুন রঙের চমৎকার টেলিফোন।

পনের ফুট দূরে মেঝেতে ছেলে-মেয়ে-জামাই এবং নাতি-নাতনীদের নিয়ে প্রভাবতী কী করছে, উমাপতির সেদিক লক্ষ্য ছিল না। খিঁচ ব্যথায় কষ্ট পেতে পেতে দীপার কথাই তিনি

ভাবছিলেন। অচেনা জায়গায় সে ঠিকমতো রাত কাটাতে পারল কিনা, কোনরকম বিপদ-আপদ ঘটল কিনা, মেইড-সারভ্যান্টটা এসে পৌঁছেছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ভাবনা তাঁর মাথার ভেতর এই মুহূর্তে গিস গিস করছে। সাদার্ন অ্যাভেনিউর ফ্ল্যাটে জামা-কাপড় খাবার-দাবার সব কিছুই রয়েছে। তা ছাড়া ড্রেসিং টেবলে ড্রয়ারে তিন চারশো নগদ টাকাও রেখে এসেছেন, কিন্তু কাল তাড়াহুড়োয় দীপাকে টাকার কথা বলে আসতে একেবারেই ভুলে গেছেন। দীপার খোঁজ নিয়ে টাকার কথাটা জানিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত উমাপতি ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিলেন। টাকা পয়সার কখন কী দরকার হয়, কিছুই তো বলা যায় না।

কাল রাত্তিরে চাঁদ অশ্লেষা নক্ষত্রে ঢুকবার ঠিক এক মিনিট আগে দীপা সাদার্ন এ্যাভেনিউর ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল। গ্রহ-ট্রহরা থাকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে। কখন তারা এক ঘর থেকে আরেক ঘরে, এক ডিগ্রি থেকে আরেক ডিগ্রিতে যাচ্ছে, এতদূরে বসে তার হিসেব করা সোজা ব্যাপার নয়। পাঁজীতে যদিও সময়টা দিয়েছে তবু হিসেবের যে গোলমাল হয় নি, তার গ্যারাণ্টি কে দিতে পারে? কোন কারণে গোলমালটা যদি হয়েই থাকে আর দীপা যদি অশ্লেষা নক্ষত্রে চাঁদ ঢোকার পর সাদার্ন এ্যাভিনিউর ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকে তা হলে যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আর তখন পুলিশ আসবে, খবর কাগজের লোকেরা আসবে, ফুর্তি করার জন্যে এই বয়সে তাঁর মেয়েমানুষ রাখার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। তারপর বাড়িতে প্রভাবতী এবং ছেলেমেয়েরা, বাইরে আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর কী হাল দাঁড় করাবে, ভাবতে গিয়ে মনে হয় ব্লাড সুগার হুড় হুড় করে 'ফল' করছে, কিডনির ট্রাবলটা আবার চাগিয়ে উঠছে, মাথার পেছন দিকে সেরিব্রাল পয়েন্টটা দপ দপ করছে। স্ট্রোক ফ্রোক হয়ে যাবে না তো?

পরমেশের কথায় কড়কড়ে দেড় লাখ টাকায় একটা ফ্ল্যাট কিনে দীপাকে সেখানে তুলে কান্ডটা বোধহয় ভালো করা হয় নি। এত টাকা দিয়ে গুচ্ছের দুশ্চিন্তা জোটানোর কোন মানে হয়!

যাই হোক, সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে এইরকম খিঁচ ব্যথার

মধ্যেও দীপাকে অনেক বার ফোন করার চেষ্টা করেছেন উমাপতি। কিন্তু করতে গিয়েও পারেননি। টেলিফোনটার দিকে বার বার হাত বাড়িয়েও সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে নিয়েছেন। কেননা প্রভাবতী যদি তাঁকে একবার ফোন করতে দ্যাখে, বিপদে পড়ে যেতে হবে। কাকে ফোন করছে, কেন করছে—যাবতীয় খুঁটিনাটি না জানা পর্যন্ত রেহাই পাওয়া যাবে না। আর প্রভাবতী যে ধরনের মহিলা, পেটের ভেতর আঙুল পুরে আসল কথাটি ঠিক বার করে আনবে। তারপর কী হতে পারে, ভাবা যায় না।

ঘরটা যে একটু ফাঁকা হবে, তার কোনরকম লক্ষণ নেই। প্রভাবতী ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী নিয়ে যেভাবে মেঝেতে বটগাছের মতো ঝুরি নামিয়ে বসে আছে তাতে সহজে উঠবে বলে তো মনে হয় না।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর মরিয়া হয়ে উমাপতি যখন টেলিফোনটায় হাত ঠেকিয়েছেন সেই সময় আচমকা প্রভাবতী এদিকে ঘাড় ফেরালো, 'শুনছ—'

চোখের পাতা পড়বার আগেই সট করে হাতটা টেনে নিলেন উমাপতি। বালিশের ওপর মাথাটা কয়েক ইঞ্চি উঁচুতে তুলে সাড়া দিলেন 'কী বলছ ?'

প্রভাবতী বলল, 'মনোজ শেফালী চামেলী সন্তোষ—ওরা সবাই চাইছে আমাদের বিবাহ-বার্ষিকীর ছবি খবরের কাগজে ছাপাবে।'

উমাপতি বুঝতে পারলেন, ছবি ছাপার ব্যাপারে প্রভাবতীর খুবই উৎসাহ। আস্তে করে বললেন, 'ভালই তো।'

'ছাপার জন্যে দু হাজার টাকা লাগবে।'

এভাবে বাজে খরচ করার ইচ্ছা একেবারেই নেই উমাপতির। অন্য সময় হলে হয়ত আপত্তি করতেন। অবশ্য আপত্তি করেও যে কোন কাজ হতো এমন কোন গ্যারান্টি নেই। সুড়সুড় করে টাকাটা বারই করে দিতে হত। তা ছাড়া দেড় লাখ টাকা খরচ করে ফ্ল্যাটে মেয়েমানুষ রেখে আসার পর এক ধরনের পাপবোধ তাঁর মধ্যে কাজ করছে। দুর্বল মিয়ানো গলায় বললেন, 'আচ্ছা—'

প্রভাবতী আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় ডাক্তার চট্টরাজ ঘরে ঢুকলেন। চট্টরাজের বয়স ষাটের কাছাকাছি। বোতলের

মতো লম্বা মুখ, নাকের ঠিক তলায় স্যার আশুতোষের মতো ঝাঁপানো গোঁফ, মাথার ডান দিক ঘেঁষে সিঁথি, বাঁ পাশে চুলগুলো চেপে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। চোখে সাবেক আমলের মতো সুতোয়-বাঁধা রিম-লেস চশমা। পরনে সিল্কের ট্রাউজার আর সিল্কের ফুল শার্ট, বুকে সোনার চেনে-আটকানো পকেট ঘড়ি। হাতে ঢাউস মেডিক্যাল ব্যাগ।

ডাক্তার চট্টরাজ উমাপতির ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান। কমপেনসেসন পাবার পর মাসিক সাতশো টাকায় তাঁকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। সপ্তাহে তিনি সাতদিন এ বাড়িতে আসেন। দু দিন আসেন পুরোপুরি উমাপতির জন্য; দু দিন প্রভাবতীর জন্য; দু দিন ছেলেমেয়েদের জন্য আর একদিন বাড়ির চাকর-বাকরদের জন্য। সারা সপ্তাহ ধরে গোটা বাড়ির স্বাস্থ্য চেক-আপ করে যান ডাক্তার চট্টরাজ। আজ উমাপতিকে দেখার 'ডেট'।

চট্টরাজ ঘরে ঢুকতেই ছেলেমেয়েরা উঠে বাইরে চলে গেল। কেননা ডাক্তার এলেই তাঁর সামনে প্রভাবতী স্বামীর স্বাস্থ্য টাস্থ্য নিয়ে বাজখাঁই গলায় একদফা বকা-ঝকা করেন। তখন কাছে থাকাটা ঠিক না। প্রভাবতী চটপট ম্যারেজ এ্যানিভার্সারির ফোটো-গুলো প্যাকেটে পুরে হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে সুবিশাল শরীর টেনে তুলল।

উমাপতির খাটের পাশে ক'টা উঁচু উঁচু ফোম-বসানো মোড়া রয়েছে। মেডিকেল ব্যাগটা খাটের একধারে রেখে একটা মোড়ায় বসতে বসতে চট্টরাজ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছেন?' বলতেই উমাপতির সারা গায়ে গুচ্ছের হট ওয়াটার ব্যাগ চোখে পড়ল, 'এসব কী? কালও এসেছিলাম। বডি বেশ ফিট ছিল। হঠাৎ সেঁক দেবার দরকার হল যে?'

খিঁচ ব্যথার কথাটা বললেন উমাপতি। চট্টরাজ কোমর এবং শিরদাঁড়া টিপেটুপে দেখে বললেন, 'ও কিছু না, সেরে যাবে। হাত বাড়ান, ব্লাড প্রেসারটা দেখি—'

উমাপতি হাতটা সামনের দিকে এগিয়ে দিলেন। তার ফাঁকে মেডিক্যাল ব্যাগ থেকে প্রেসার মাপার বাক্স বার করে ফেলেছেন চট্টরাজ। উমাপতির হাতে কাপড় জড়িয়ে পাম্প করে করে প্রেসারটা

মাপতে মাপতে হঠাৎ তাঁর চোখ কুঁচকে গেল। তাড়াতাড়ি নোটবুক দেখে বললেন, 'এ কি, কালও আপনার প্রেসার দেখে গেছি। একদিনে এত বেড়ে গেল কী করে?'

উমাপতির বুকের ভেতরটা দুলে উঠল। গলার মধ্যে আবছা গোঙানির মতো একটা শব্দ করলেন তিনি।

এতক্ষণে প্রভাবতী খাটের কাছে চলে এসেছিল। ডাক্তারকে দেখে ভুরু অব্দি ঘোমটা টেনে দিয়েছে। কিন্তু গলায় তবলার লহরা তুলে বলল, 'বাড়বে না! কাল রাত্তিরে পোড়ারমুখো ক'টায় বাড়ি ফিরেছে জিজ্ঞেস করুন ডাক্তারবাবু। এখন গরম জলের ব্যাগ জড়িয়ে ধরে মুরগির মতো ক্যাঁকোর-কোঁ ক্যাঁকোর-কো হচ্ছে। আবার প্রেসারটাও চড়িয়ে বসা হয়েছে।'

কাল রাত্তিরে দীপাকে সাদার্ন এ্যাভেনিউর ফ্ল্যাটে রেখে বাড়ি ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। তার ফাঁকে তুমুল কাণ্ড হয়ে গেছে। রাগ চড়লে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না প্রভাবতীর; হাতের কাছে যা থাকে তাই ছুঁড়তে থাকে। কাল রাতে ডজনখানেক কাচের গ্লাস চুরমার হয়েছে, একটা নতুন ট্রানজিস্টর আর দামী এক সেট ক্রকারি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়েছে।

ডাক্তার চট্টরাজ নোটবুকে প্রেসার টুকতে টুকতে বললেন, 'কাল ক'টায় বাড়ি ফিরেছেন?'

করুণ গলায় উমাপতি বললেন, 'আমার তো মনে হয় সাড়ে নটা পৌনে দশটা নাগাদ—'

প্রভাবতী বাঘিনীর মতো হুংকার দিল, 'মিথ্যেবাদী! সাড়ে দশটায় বাড়ি ঢুকেছে ডাক্তারবাবু। পয়সা হবার পর কী যে এক ক্লাবের বাই হয়েছে! এই বলে রাখছি, কালই শেষ। এরপর যদি সাড়ে ন'টার পর এক মিনিট দেরি হয়, বাড়ি ঢুকতে দেব না। মনে থাকে যেন।'

প্রভাবতীর চিৎকার চেঁচামেচিটা ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিকের মতো। এর মধ্যেই রোগীর স্বাস্থ্য চেক-আপ করার অভ্যাস করে ফেলেছেন ডাক্তার চট্টরাজ। প্রেসারের হিসেব লেখা হয়ে গিয়েছিল। নোটবুকটা মেডিক্যাল ব্যাগে পুরতে পুরতে বললেন, 'কাল কোন-রকম একসাইটমেন্ট হয়েছে কি?'

চুয়ান্ন বছর বয়সে আনন্দ করার জন্য তেইশ বছরের একটি মেয়েকে এনে ফ্ল্যাটে তোলা হয়েছে। এর চাইতে উত্তেজক ঘটনা আর কী হতে পারে! উমাপতি চমকে উঠলেন; এতটাই নার্ভাস হয়ে পড়লেন যে তাঁর ঘাড়ে গলায় বিন বিন করে ঘাম ফুটতে লাগল। মিনমিনে দুর্বল গলায় বলল, 'না, মানে তেমন কোন একসাইটমেন্টের ব্যাপার মনে পড়ছে না তো—'

'খাওয়া-দাওয়ার কোন অনিয়ম হয়েছে?' ডাক্তার চট্টরাজ প্রেসার মাপার বাক্সটা বন্ধ করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন।

স্ত্রীকে লুকিয়ে চুরিয়ে ক্লাবে বসে তিনি যে নিয়মিত রোজ সন্ধ্যেয় বীয়ার খেয়ে যাচ্ছেন, সেটা তো আর বলা যায় না। স্বীকারোক্তি করতে গেলে প্রভাবতী নির্ঘাত তাঁর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। উমাপতি এবার গল গল করে ঘামতে লাগলেন। বললেন, 'খাওয়ার অনিয়ম হবার উপায় নেই ডাক্তারবাবু। এর চোখে ধুলো দিয়ে কিছু কি করার জো আছে?' বলে চোখের কোণ দিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

প্রভাবতী গলার স্বরটাকে শেষ পর্দায় তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই অনিয়ম হচ্ছে। রোজ সন্ধ্যেবেলা আমাকে এক পাক ঘুরিয়ে বাড়িতে নামিয়ে দিয়েই ক্লাবে ছুটছে। সেখানে কী গিলছে তা তো আর দেখতে পাই না। এবার ক্লাব থেকে ফিরলেই আপনাকে ফোন করব ডাক্তারবাবু। কী একটা নল আছে না, পেটের ভেতর ঢুকিয়ে সব বার করে আনা যায়; আপনি সেটা নিয়ে আসবেন।'

প্রভাবতী সব পারে। হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিয়ে গলার কাছে উঠে এল যেন উমাপতির। পারতপক্ষে তিনি মিথ্যে বলেন না। কিন্তু এখন প্রাণের দায়ে বলতে হল, 'মা কালীর দিব্যি প্রভা, আমি বাইরে কিছু খাই না। বিশ্বাস কর; যার নামে দিব্যি দিতে বলবে তার নামে দেব।'

উমাপতির কোণঠাসা অসহায় অবস্থা দেখে ডাক্তার চট্টরাজের করুণাই হয়ে থাকবে। তাঁর দিকে টেনে সালিসীর ভঙ্গিতে প্রভাবতীকে তিনি বললেন, 'বকাবকি করে তো কিছু লাভ হবে না। আমি একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি। ওটা এনে উমাপতিবাবুকে

খাওয়ান, আর বিকেল পর্যন্ত বিছানা থেকে উঠতে দেবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।' একটু থেমে বললেন, 'আপনার প্রেসারও কিন্তু হাই। এত চেঁচামেচি করলে 'সিক' হয়ে পড়বেন।' সিক শব্দটার ওপর অস্বাভাবিক জোর দিলেন ডাক্তার চট্টরাজ। তারপর প্যাডের কাগজে উমাপতির জন্য প্রেসক্রিপসান লিখতে লিখতে ফের বললেন, 'কাল কিন্তু আপনার 'ডেট' মিসেস সমাদ্দার।'

প্রভাবতী বলল, 'জানি।'

'অনেকদিন ব্লাড সুগার চেক করা হয় নি। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে রেডি হয়ে থাকবেন। আমি এসে রক্ত নিয়ে যাব।'

'আচ্ছা—'

একটু পর ব্যাগ গুছিয়ে উঠে পড়লেন চট্টরাজ। চলে যাবার সময় রোজই একবার উমাপতির দিকে তাকান, আজও তাকালেন। উমাপতি এই মুহূর্তটার জন্য রোজই দম বন্ধ করে থাকেন। চোখাচোখি হতেই তিনি একটা ইসারা করলেন। ডাক্তার সেটা বুঝলেন, প্রভাবতীর দিকে ফিরে এবার বললেন, 'আমি চলে যাবার পর উমাপতিবাবুকে বকা-ঝকা করবেন না। পেসেণ্টের পীস দরকার।' বলেই চোখের কোণ দিয়ে উমাপতিকে দ্রুত একবার দেখে নিলেন। কৃতজ্ঞতায় উমাপতির মুখ ভরে গেছে।

ডাক্তার চট্টরাজ জানেন তিনি চলে যাবার পর ঘণ্টাখানেক চুপ-চাপ থাকবে প্রভাবতী। উমাপতিও তা জানেন। তারপরেই সব বেমালুম ভুলে গলার স্বর পর্দায় পর্দায় তুলে বাড়ির ভিত কাঁপিয়ে দেবে সে। তবু যেটুকু সময় শান্তি পাওয়া যায়।

সিঁড়িতে ডাক্তার চট্টরাজের জুতোর শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই একটা চাকর দৌড়ে এসে খবর দিল, 'সেন সাহেব এসেছেন।'

অর্থাৎ পরমেশ সেন। পরমেশের আদব-কায়দা অন্যরকম! আগে থেকে জানান না দিয়ে তিনি ওপরে আসেন না। প্রভাবতী অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'এক্ষুনি এখানে নিয়ে আয়।'

সাত

পরমেশকে দারুণ খাতির করে প্রভাবতী। তার কারণ এই ভদ্রলোক না ব্যবস্থা করে দিলে পূর্ব পাকিস্তানে ফেলে আসা প্রপার্টির জন্য একটা ঘষা আধলাও ক্ষতিপূরণ পাওয়া যেত না। আর ক্ষতিপূরণ না পেলে এই বাড়ি, ফ্রিজ, টি-ভি, এয়ারকুলার, গাড়ি, চাকর-বাকর, বিয়ের সিলভার জুবিলী, খবরের কাগজে ফোটো ছাপা—কিছুই হতো না। পরমেশকে অন্য কারণে খানিকটা ভয় করে প্রভাবতী। এই ভদ্রলোক উমাপতিকে ক্লাবে নিয়ে মেম্বার করে দিয়েছেন। সেখানে রোজ সন্ধ্যেবেলা উমাপতি গিয়ে কী করে বেড়াচ্ছেন সে সম্বন্ধে তার কিছুটা দুশ্চিন্তা আছে। তবে এই নিয়ে তেমন একটা চেঁচামেচি করা যায় না। করলে এবং সেটা জানতে পারলে পরমেশ দুঃখ পাবেন। যে লোক তাদের এত হিতাকাঙ্খী তাঁকে দুঃখ দেওয়াটা কাজের কথা নয়।

পরমেশ ওপরে উঠে এসেছিলেন। দরজার কাছে প্রথমেই প্রভাবতীর সঙ্গে দেখা। মিষ্টি হেসে ঘাড় হেলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'ভাল আছেন?'

প্রভাবতী বলল, 'আমি তো ভালই আছি। আপনার বন্ধুই খিঁচ ব্যথা ধরিয়ে, প্রেসার বাড়িয়ে বিছানায় পড়ে আছে। কাল রাত্তিরে আপনার বন্ধুটি কী করেছে বলুন তো?'

পরমেশের মতো স্মার্ট ঝকঝকে মানুষও প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। তারপর দ্রুত উমাপতির চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা আন্দাজ করে বললেন, 'ও কিছু না। শরীরের কথা কে বলতে পারে! কখন কী হয়ে যায়—বলতে বলতে উমাপতির খাটের এক ধারে গিয়ে বসলেন।

ডাক্তার চট্টরাজের সামনে একচোট হয়ে গেছে। কাজেই এ ব্যাপারটা নিয়ে প্রভাবতী আর টানা-হ্যাঁচড়া করল না। পরমেশের দিকে ফিরে বলল, 'কী খাবেন বলুন—'

পরমেশ বললেন, 'কিচ্ছু না; আমি বাড়ি থেকে খেয়েই বেরিয়েছি।'

'তাই কখনো হয়—'

'না-না, প্লীজ না। এখন খেতে হলে মরে যাব।'

'ঠিক আছে, মরেন কি বাঁচেন, আমি দেখব।' প্রভাবতী প্রায় দেড় কুইন্টাল ওজনের শরীরটাকে নিয়ে দুলতে-দুলতে নিচে চলে গেল। পরমেশ এলে নিজের হাতে খাবার নিয়ে আসে সে।

এ সময়ে পরমেশ কোনদিন আসেন না। উমাপতি অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি হঠাৎ!'

পরমেশ বন্ধুর দিকে ফিরে বললেন, 'কাল ক্লাব থেকে সেই যে বেরুলে, তারপর তোমার আর খবর নেই। তোমাদের ফার্স্ট নাইটটা কি রকম কাটলো জানবার জন্যে দারুণ কিউরিওসিটি হচ্ছিল। অফিস যাবার পথে ভাবলাম একবার খোঁজটা নিয়ে যাই।'

উমাপতি কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই পরমেশ ফের বললেন, 'এক নাইট কাটিয়েই চার চারটে হট ওয়াটার ব্যাগ নিয়ে পড়লে। তোমার স্ত্রী বলছিলেন ব্লাড প্রেসারটাও বেড়ে গেছে। তুমি একেবারে ওয়ার্থলেস।' বলেই নাকের ভেতর শব্দ করে হাসলেন।

উমাপতি হাতের ওপর ভর দিয়ে আধশোয়ার মতো করে উঠে বসলেন। তারপর বললেন, 'তোমার বুঝি ধারণা, কাল রাত্তিরটা আমি সাদার্ন এ্যাভেনিউর ফ্ল্যাটে কাটিয়ে এসেছি?'

পরমেশ অবাক হলেন, 'তা হলে!'

কাল দীপাকে পেঁছে দেবার পর থেকে যা-যা ঘটেছে তার যাবতীয় বিবরণ দিয়ে গেলেন উমাপতি। প্রভাবতীর হাতে ক'টা কাপ ক'টা কাচের গ্লাস ভেঙেছে তা-ও বাদ দিলেন না। সব ঘটনা বলার পর বললেন, 'এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ রাতটা যদি সত্যি সত্যিই সাদার্ন এ্যাভেনিউতে কাটিয়ে আসতাম তুমি আমাকে এখানে দেখতে পেতে না। আমার ডেডবডি হয় মর্গে, নইলে শ্মশানে থাকত।'

চুক চুক করে জিভের ডগায় সহানুভূতিসূচক একটা শব্দ করলেন পরমেশ।

উমাপতি থামেন নি, 'আমার আর লাইফ এনজয় করে দরকার নেই ভাই। কিছু না করেই একদিনে আমার যা হাল হয়েছে তাতে এনজয়মেন্ট মাথায় থাক।'

পরমেশ এবার বললেন, 'শুধু শুধু এত ভেঙে পড়ছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কী করে ঠিক হবে। ঘরে ছিন্নমস্তা বউ। সে বে'চে থাকতে বাইরে রাত কাটাবার কথা আমি ভাবতেও পারি না। আর রাত্তিরে বাইরে না থাকলে এনজয়মেণ্টটা হবে কী করে? তোমার কথায় নেচে উঠে ঝোঁকের মাথায় কী ক্যাচাকলে যে পড়লাম।'

'ভেবো না, বাইরে রাত কাটাবার একটা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা চিন্তা করে দেখছি।'

'কিন্তু শরীর স্বাস্থ্য? মেয়েটাকে না ছুঁয়েই একদিনে ব্লাড প্রেসার চড়চড়িয়ে চড়ে গেল। এর পর যদি কিছু করতে যাই, আর কি আমি প্রাণে বাঁচব?'

পরমেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'অত চিন্তা করছ কেন? তোমার শরীর আমি ঠিক করে দেব।'

উমাপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করে?'

'আমার জানাশোনা একজন ভাল স্পেশালিস্ট আছে। আজ সন্ধেবেলা ক্লাবে না গিয়ে তোমাকে তাঁর চেম্বারে নিয়ে যাব। ওঁর ট্রিটমেণ্টে থাকলে তিন দিনে তোমার শরীর একেবারে ইয়াং ম্যানদের মতো ফিট হয়ে যাবে। ভদ্রলোক কিসে স্পেশালাইজ করেছেন জানো?'

'উ-হু-হু—' মুখটা ছুঁচলো করে কাতর শব্দ করলেন উমাপতি। পরমেশের দিকে কাত হতে গিয়ে সেই খিঁচ ব্যাথাটা আবার চিড়িক দিয়ে উঠেছে। হট ওয়াটার ব্যাগ চেপে ধরে একটু সামলে নিয়ে কিছুক্ষণ বাদে তিনি বললেন, 'কিসে?'

পরমেশ উমাপতির কানের কাছে মুখ নিয়ে ষড়যন্ত্র করার ভঙ্গিতে বললেন, 'আমাদের মতো যারা মিডল-এজেড, উনি তাদের টগবগে জোয়ান ঘোড়া বানিয়ে দেন।'

উমাপতি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তার মানে?'

পরমেশ বললেন, 'আরে বাবা, এই বয়সে সেক্স-টেক্স নষ্ট হয়ে যায়। উনি সেটাকে চার্জ মেরে মেরে চাঙ্গা করে দেন। ওঁর ট্রিটমেন্টে থাকলে এমন এনার্জি পাবে যে মনে হবে জোয়ান ছোকরাদের মতো খালি উড়ি।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'আমি যে ডাক্তার চট্টরাজের ট্রিটমেন্টে আছি। তাঁর ওপর আমার গিন্নীর খুব বিশ্বাস। এখন ডাক্তার বদলাতে গেলে ভীষণ ঝঞ্ঝাট হয়ে যাবে।'

একটু ভেবে পরমেশ বললেন, 'তোমার স্ত্রী বা ডাক্তার চট্টরাজকে কিছু জানাবার দরকার নেই। আমি লুকিয়ে তোমাকে স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে যাব।'

'সে তো আরেক বিপদ—'

'বিপদ কেন?'

'তখন ডাক্তার চট্টরাজের ওষুধও খেতে হবে, ইঞ্জেকসন নিতে হবে, আবার তোমার স্পেশালিস্টেরও ওষুধ ইঞ্জেকসন চলবে। এত ওষুধ আর এত ইঞ্জেকসানে আমি মরে যাব ভাই।'

সাহস দেবার ভঙ্গিতে উমাপতির কাঁধে আলতো করে একটা টুসকি মেরে পরমেশ বললেন, 'কিচ্ছু হবে না। সব ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গলার স্বরটা গভীরে নামিয়ে পরমেশ আবার বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার আরেকটা কথা ছিল উমাপতি—'

উমাপতি মুখ তুলে তাকালেন, 'কী?'

'আমাকে হাজার কুড়ি টাকা দিতে হবে। ভীষণ আটকে গেছি।'

'অত টাকা কোথায় পাব?'

'ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দেবে। কাল-পরশুর ভেতর হলেই চলবে।'

'কিন্তু—'

উমাপতির মনোভাবটা বুঝতে পারছিলেন পরমেশ। টাকাটা দেবার একেবারেই ইচ্ছা নেই তাঁর। পরমেশ এবার বললেন, 'দেশের প্রপার্টির জন্য কোনদিন কমপেনসেশন পাবে, ভাবতে পেরেছিলে? ছোটাছুটি করে একে-ওকে ধরে অতগুলো টাকা তোমাকে পাইয়ে দিলাম। মিনিমাম টু পারসেণ্ট কমিশন দিলেও আমার শেয়ারে কত পড়ে একবার ভেবে দেখেছ? আমি তো একটা পয়সাও তোমার কাছ থেকে পাই নি।'

উমাপতি চুপ করে রইলেন।

পরমেশ এবার বললেন, 'কেউ যদি জানতে পারে তুমি ক্লাবে চুক চুক করে রোজ বীয়ার খাচ্ছ, একটা ফ্ল্যাট কিনে মেয়েমানুষ এনে

রেখেছ, আর এইসব খবর সে যদি তোমার স্ত্রীকে দিতে চায়, তার মুখ সেলাই করার জন্যে কত টাকা খসাতে হবে—তা তুমিই ভেবে দেখ।'

শুনতে শুনতে উমাপতির চুল খাড়া দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি ঝাপসা কাঁপা গলায় বলতে লাগলেন, 'তুমি এই সব কথা আমার গিন্নীকে বলবে নাকি?'

'পাগল। আমি না তোমার বুজম ফ্রেন্ড। আমি অন্য লোকের কথা বলছিলাম।'

উমাপতি পরমেশের দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড কী ভাবলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, পরশু দিন টাকাটা পাবে।'

'বাঁচালে ভাই। কী মুশকিলে যে পড়েছি।'

উমাপতি উত্তর দিলেন না। তিনি বুঝতে পারছিলেন, লাইফ এনজয় করতে গিয়ে একটা ইঁদুরকলে পা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এখন থেকে পরমেশ মাঝে মাঝেই টাকা আদায় করবেন। উমাপতি আর ভাবতে পারছিলেন না। যা হবার হোক—এমন একটা ভঙ্গি করে তিনি গা ছেড়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর হঠাৎ আবার দীপার কথা মনে পড়ে গেল উমাপতির। মেয়েটার খবর নেওয়া দরকার। তা ছাড়া ড্রয়ারের ভেতরের টাকাটার কথাও তাকে জানিয়ে দিতে হবে। উমাপতি একবার দরজার দিকে তাকালেন। নাঃ, দেড় কুইন্টাল ওজনের শরীর নিয়ে এখনও প্রভাবতী ফিরে আসতে পারে নি। এই সুযোগ, এটা কাজে লাগাতে না পারলে দীপাকে ফোন করা হবে না।

উমাপতি বললেন, 'পরমেশ একটা কাজ করবে ভাই?'

পরমেশ জানতে চাইলেন, 'কী?'

'আমি একটা ফোন করব, তুমি দরজার কাছে গিয়ে একটু দাঁড়াও। প্রভাকে আসতে দেখলেই আমাকে জানিয়ে দেবে।'

'কাকে ফোন করবে?'

'দীপাকে।'

চট করে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে একটু হাসলেন পরমেশ। তারপর উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালেন।

উমাপতি ডায়াল ঘুরিয়ে দীপাকে ধরলেন। ও ধার থেকে গলার স্বর ভেসে আসতেই বললেন, 'আমি উমাপতি সমাদ্দার বলছি— কাল রাত্তিরে কোন অসুবিধা হয়নি তো?'

দীপার কাঁপা কাঁপা দুর্বল গলা শোনা গেল, 'না।'

'নতুন জায়গায় ভালো ঘুম হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'একটা জরুরী কথা শুনে নাও, ড্রেসিং টেবলের সেকেণ্ড ড্রয়ারে টাকা আছে। কাল তোমাকে বলে আসতে ভুলে গেছলাম; দরকার হলে ওখান থেকে নিও।'

'আচ্ছা।'

'সাবধানমতো থাকবে।'

'থাকব।'

'কেউ কোন রকম ডিস্টার্ব করেনি তো?'

'না।'

এই সময় দরজার কাছ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে পরমেশ চাপা গলায় বললেন, 'আসছে—'

টেলিফোনে মুখ গুঁজে গলার স্বরটা ঝপ করে অনেকখানি নামিয়ে দিলেন উমাপতি। তারপর দ্রুত বলে গেলেন, 'আমার শরীরটা ভীষণ খারাপ হয়েছে। তোমার ওখানে আজ যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। পরে আবার ফোন করব।'

দীপা বলল, 'আচ্ছা। আমার একটা—'

তার কথা শেষ হবার আগেই পরমেশ আগের গলায় বললেন, 'স্টপ। এসে পড়েছে—'

উমাপতি ঝড়াং করে ক্রেডেলের ওপর ফোন রেখে দিলেন। দীপার শেষ কথাগুলো আর শোনা হল না।

তৎক্ষণে পরমেশ আবার এসে খাটের ওপর বসেছেন। প্রভাবতী বড় প্লেটে করে সন্দেশ, রাবড়ি এবং কিছু ফল সাজিয়ে ঘরে ঢুকল। পরমেশের সামনে একটা টেবলের ওপর প্লেটটা রেখে বলল, 'খান—'

পরমেশ বুঝতে পারছিলেন, আপত্তি করে কাজ হবে না। অফিসেরও সময় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে রুমালে মুখ

মুছতে মুছতে উমাপতিকে বললেন, 'এখন চলি, সন্ধ্যেবেলা আসব।'

'ঠিক আছে।' উমাপতি ঘাড় কাত করলেন।

আট

বিকেলে পাঁচটা বাজবার আগেই কামিনী চা করে দীপাকে খাওয়াল, নিজেও খেল। তারপর ঘরটর ফিটফাট করে বলল, 'এবাব আমাকে দু ঘণ্টার ছুটি দিতে হবে দিদিমণি। হাওয়া খেতে যাব।'

কামিনী এমনিতে ভয়ানক চটপটে। চোখের পলক পড়তে না পড়তে একেকটা কাজ সেরে ফেলে। কাজও বেশ পরিষ্কার। এ ব্যাপারে তাকে কিছু বলার নেই। যাই হোক, দীপার মনে পড়ল, সকালেই ছুটির কথা বলে রেখেছে কামিনী। দুঘণ্টার জন্য সে তার লাভারের সঙ্গে বেড়াতে যাবে। দীপা বলল, 'আচ্ছা যাও—'

কামিনী তক্ষুনি গা ধুয়ে একটা বুটিদার সিনথেটিক্সের শাড়ি পরে ড্রেসিং টেবলের সামনে সাজতে বসে গেল। ঠোঁটে মোটা করে লিপস্টিক লাগালো, গালে তিল আঁকলো, উঁচু করে খোপা বাঁধলো। তারপর পাউডার মেখে সেণ্ট ঢেলে উঁচু হিলের জুতো পরে বেরিয়ে গেল।

কামিনী বেরিয়ে যাবার পর দীপা এখন একেবারে একা। চুপ-চাপ বসে থাকতে থাকতে একবার সোদপুরে তাদের বাড়ির কথা মনে পড়ল, পরক্ষণই উমাপতির মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। উমাপতির শরীর খারাপ, তিনি আজ আর এখানে আসতে পারবেন না। কথাটা ভাবতেই মনটা হাল্কা হয়ে গেল দীপার। শেষ সময়ে উমাপতি যদি মত না বদলান, আজকের দিনটাও বেঁচে যাবে দীপা।

বেডরুমের সোফায় বসেছিল সে। এক সময় আস্তে আস্তে উঠে রাস্তার দিকের ব্যালকনিতে চলে এল।

এখন, এই বিকেলবেলায় লেকের দিকের সবুজ গাছপালার মাথায় হাজার হাজার পাখি উড়ছিল। ডিমের কুসুমের মতো নরম হলুদ রোদ চারদিকের হাইরাইজ বিল্ডিং, রাস্তা, মানুষজন এবং

গাড়িটাড়ির গায়ে জড়িয়ে আছে। গোটা আকাশে এক টুকরো মেঘও চোখে পড়ছে না। পালিশ-করা ঝকঝকে একখানা আয়নার মতো দিগন্তের ফ্রেমে সেটা আটকে আছে।

দূরমনস্কর মতো চারপাশের দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে দীপার চোখ নিচের রাস্তায় নেমে এল। কাল রাত্তিরে লক্ষ্য করে নি, আজ দীপা দেখতে পেল, রাস্তার মাঝখানে বুলভারে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সুন্দর করে বাগান সাজিয়েছে। লাল-হলুদ-নীল, নানা রঙের ফুলে চমৎকার একখানা নকশা ফুটে আছে। বাগান দেখতে দেখতে হঠাৎ দীপার চোখে পড়ল, রাস্তা পার হয়ে কামিনা আর তার একজন সঙ্গী ওপারে চলে যাচ্ছে। লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল, চওড়া জুলপি। এত দূর থেকে মুখ চোখ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। তবে লোকটার চেহারা বেশ মজবুত। পরনে আজকালকার ছোকরাদের মতো চক্রাবক্রা শার্ট আর ট্রাউজার। এই তা হলে কামিনীর লাভার। 'লাভার' কথাটা আজ সকালেই কামিনী বলেছে। মনে পড়তে নিজের অজান্তেই হেসে ফেলল দীপা। আরেকটা কথা ভেবে দীপার ভালো লাগলো, প্রেমিককে এই ফ্ল্যাটে এনে ঢোকায় নি কামিনী; বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে সেজেগুজে নিজেই বেরিয়ে গেছে।

রাস্তা পার হয়ে এক সময় ওরা লেকের দিকে অদৃশ্য হলো। আর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দীপার আচমকা মনে হলো, কামিনীর যেটুকু স্বাধীনতা আছে তার এক ফোঁটাও তার নেই। ইচ্ছা করলেই সে এখন বেরিয়ে যেতে পারে না। কখন উমাপতি ফোন করে বসবেন তার ঠিকঠিকানা নেই। পয়সা দিয়ে যখন তিনি তাকে কিনেছেন, দেড় লাখ টাকার ফ্ল্যাটে এনে তুলেছেন তখন সপ্তাহের ছ'দিন পুরো চব্বিশটি ঘণ্টা এখানেই আটকে থাকতে হবে। দীপাকে ঘিরে অদ্ভুত এক বিষাদ ঘন হতে লাগলো। আশ্চর্য এক কষ্ট বুকের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে উঠে এসে গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে গেল।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল দীপার খেয়াল নেই। এক সময় কে যেন বলে উঠল, 'রাস্তা ছাড়া আর কোনদিকে তাকাবেন না নাকি ?'

চমকে দীপা ডাইনে ঘাড় ফেরাল। রজত ওদের ফ্ল্যাটে রাস্তার দিকে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে।

এই হাই-রাইজ বিল্ডিংটা ইংরেজিতে 'এল' অক্ষরের মতো। কাজেই রজতদের ফ্ল্যাটের গোটাটাই দেখা যাচ্ছিল। ওখান থেকে দীপা যে এধারের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে সেটাও পুরো চোখে পড়ে। দীপা বলল, 'ও, আপনি। আমি ভাবলাম, কে না কে!'

রজত জিজ্ঞেস করল, 'একা-একা কী করছেন?'

'কী আর করব, রাস্তা দেখছি।'

'বাইরে বেরোন নি?'

একটু দ্বিধা করে দীপা বলল, 'না।'

রজত এবার বলল, 'সারাদিন বাড়িতেই কনফাইন্ড ছিলেন?'

দীপা আবছাভাবে একটু হাসল।

রজত বলল, 'আমিও ফ্ল্যাট থেকে বেরুই নি। আপনার ওখানে আর কে কে আছে?'

দীপা বলল, 'কেউ না। কাজের মেয়েটা ছিল, একটু আগে বেড়াতে গেল।'

'আমার ফ্ল্যাটেও কেউ নেই। হোল ডে একা-একাই বসে আছি।'

রজতের কথাটা সত্যি কিনা কে জানে। তবে তার চোখমুখ দেখে অবিশ্বাস করার মতো মনে হলো না। দীপা তার দিকে এক পলক তাকালো, তবে কিছু বলল না।

রজত আবার কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওদের ফ্ল্যাটের কলিং বেলের শব্দ শোনা গেল। ভুরু কুঁচকে সে বলল, 'কেউ এসেছে বোধ হয়, দেখে আসি।' ব্যালকনি থেকে সামনের ঘর পেরিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দীপা দাঁড়িয়েই থাকল, অন্যমনস্কর মতো আবার সে রাস্তার দিকে তাকিয়েছে।

দু' মিনিটও কাটল না, হঠাৎ পেছন দিকের প্যাসেজ থেকে উত্তেজিত চিৎকার ভেসে এলো। গলাটা রজতের।

দীপা অবাক হলো, আবার একটু ভয় ভয়ও লাগল তার। এই দু-এক মিনিটের ভেতর হঠাৎ কী এমন ঘটতে পারে যাতে রজত এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

রজতের গলা চড়ছিলই। দীপা নিজের অজান্তেই ব্যালকনি থেকে ভেতরে চলে এলো ; তারপর ফ্ল্যাট থেকে বাইরে বেরুবার বা ভেতরে ঢুকবার দরজাটার কাছে এসে দাঁড়াল। করিডরে সমানে চিৎকারটা চলছে।

রাস্তার দিকের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রজতের চেঁচামেচি শুনেছিল দীপা। দরজার কাছে আসতে আরো একটা গলা শোনা গেল। এই গলাটা খুবই মিনমিনে আর নির্জীব।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলো দীপা ; তারপর দরজার কাচে চোখ রাখল। এখান থেকে দেখা যাচ্ছিল, রজত ওদের ফ্ল্যাটের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে আর তার সামনে মধ্যবয়সী একটা লোক। লোকটার পিঠ দুমড়ে যেন বেঁকে আছে। ভাঙাচোরা গালে আলপিনের মতো কাঁচাপাকা দাড়ি, এলোমেলো রুক্ষ চুল। পরনে ময়লা পোশাক। পায়ে তালি-মারা চটি। দেখে মনে হয় একসময় লোকটা বেশ স্বাস্থ্যবান এবং সুপুরুষ ছিল।

রজত বলছিল, 'কতবার তোমাকে বলেছি এখানে আসবে না।'

লোকটা চোরের মতো কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'আর আসব না ; এই শেষ। দশটা টাকা দিয়ে দে রজত।'

'একটা পয়সাও দেব না।'

দীপা জানে না, কখন ছিটকিনিটা খুলে ফেলেছে।

লোকটা কাকুতি-মিনতি করতে করতে বলতে লাগলো, 'দশটা টাকা না দিলে আমি মরে যাব রজত।'

রজত দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তোমার মরাই উচিত। চোখের চামড়ার একটুকু লজ্জা নেই।'

'তোর যা ইচ্ছে বল, তবে টাকাটা দে বাবা। আমাকে মেরে ফেলিস না।'

'দিলেই তো ধেনোর দোকানে গিয়ে ঢুকবে।'

'আরে না-না—' দুই হাত এবং মাথা জোরে জোরে প্রবলবেগে নেড়ে লোকটা বলল, 'ড্রিঙ্ক করা আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

রজত বলল, 'তুমি ছাড়বে ড্রিঙ্ক! অ্যাম আই টু বিলিভ ইট?'

'প্লীজ রজত, বিশবাস কর। ভগবানের নামে বলছি—'

'যার নামেই বল, তোমার মতো একটা ফোরটোয়েন্টি চীট ড্রাঙকার্ডকে কেউ বিশ্বাস করবে না। তুমি চলে যাও—'

সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে লোকটা বলল, 'কেন এরকম করছিস? তোদের এত টাকা, আমাকে মাঝে মাঝে একটু হেল্প করলে কী এমন ক্ষতি হবে। দে রজত, প্লীজ দে—'

'যত টাকাই থাক' ভিখিরীকে দিয়ে দেব, পুড়িয়ে ফেলব কিন্তু তোমাকে দেব না। যাও এখন—'

লোকটা এবার হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'রজত, প্লীজ বী কাইন্ড টু মী।'

'রোজ তুমি এসে আমাকে ডিসটার্ব করছ। কাল রাত্তিরে কুড়ি টাকা নিয়ে গেছ। বলেছিলে আর আসবে না। টোয়েন্টিফোর আওয়ার্স'ও কাটে নি, আবার হাজির হয়েছ।'

'দেখে নিস, এবারই লাস্ট। নো মোর। আর তোকে বিরক্ত করতে আসব না।'

'প্রমিজ?'

'প্রমিজ।'

রজত আর দাঁড়ালো না। ভেতর থেকে একটা দশ টাকার নোট এনে ডেলা পাকিয়ে করিডরে ছুঁড়ে দিল। তারপর বলল, 'তোমাকে আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, দিস ইজ লাস্ট। নেপালী দারোয়ানকে বলে রাখব, এবার এলে তোমাকে যেন ঢুকতে না দ্যায়।' তার চোখমুখ এবং গলার স্বর ঘৃণায় রি রি করছে।

হুমড়ি খেয়ে নোটটা কুড়িয়ে নিয়ে হাত বুলিয়ে টান টান করল নোটটা, তারপর অত্যন্ত যত্ন করে চার ভাঁজ করল। পকেটে পুরতে পুরতে ঠোঁট এবং চোখ কুঁচকে একটু হেসে বলল, 'দারোয়ানকে ওরকম ইন্সট্রাকসন দিস না রজত। আফটার অল আমি একটা মানুষ তো। কখন কী দরকার হয়ে যায়—'

গলার শির ছিঁড়ে রজত চেঁচাল, 'গেট আউট স্কাউন্ড্রেল, গেট আউট—'

দু সেকেন্ডের জন্য লোকটার মুখ বোতলের মতো লম্বা হয়ে গেল। তারপর আগের বারের মতো ঠোঁট এবং চোখ কুঁচকে আরেকবার হেসে এক দৌড়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল। তারপর

একসঙ্গে দু-তিনটে করে সিঁড়ি টপকে চোখের পাতা পড়তে না পড়তেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

রজত তাদের ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেল, দীপা এধারের ফ্ল্যাটের দরজায় বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ সে তাকে লক্ষ্য করেনি। কয়েক সেকেণ্ড থমকে রইল তারপর একটা কথাও না বলে দরজা বন্ধ করে দিল।

রজতের আচরণ অদ্ভুত লাগছিল দীপার। কয়েক মিনিট আগে পাশাপাশি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে এই ছেলেটিই কি তার সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক গলায় কথা বলছিল? হঠাৎ বিষাদের মতো কিছু একটা অনুভব করল দীপা। আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে সে ড্রইং রুমে এসে বসল। এই মুহূর্তে তার কিছুই ভালো লাগছিল না।

দশ মিনিটও কাটলো না, দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল। এখন কে আসতে পারে? কামিনী? কিন্তু সে তো দুঘণ্টার ছুটি নিয়ে লাভারের সঙ্গে লেকের হাওয়া খেতে গেছে। এখনও আধ ঘণ্টা পেরোয় নি। প্রেমিককে ফেলে এত তাড়াতাড়ি তার ফিরে আসার প্রশ্নই ওঠে না। তবে কি উমাপতি? এই লোকটার কথা এতক্ষণ মনে ছিল না। আচমকা সেই ভয়টা সির-সির করে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে স্রোতের মতো খেলে যেতে লাগলো। সেই অবস্থাতেই নিজেকে কোনরকমে টেনে তুলল সে, তারপর এলোমেলো পা ফেলে বাইরের দরজার কাছে গিয়ে সেই ছোট গোল কাচটায় চোখ রাখল। সঙ্গে সঙ্গে ভয় কেটে গিয়ে খানিকটা আরাম বোধ করল সে এবং অনেকখানি বিস্ময়ও। বাইরের করিডরে রজত দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খুলে দিয়ে দীপা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি!'

রজত বলল, 'হ্যাঁ আমিই। ঐ লোকটার সঙ্গে ওরকম বিহেভ করতে আপনি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, না?'

কথাটা ঠিক; দীপা উত্তর দিল না।

রজত আবার বলল, 'নিশ্চয়ই ভাবছিলেন ছেলেটা অভদ্র, ইতর, ক্যানটানকারাস টাইপের। বয়স্ক লোককে রেসপেক্ট দিতে জানে না—'

দীপা এবারও চুপ করে রইল।

রজত কী ভেবে খানিকটা দ্বিধার পর বলল, 'ঐ লোকটা আমার বাবা—'

তার কথা শেষ হবার আগেই চমকে দীপা মুখ তুলল। আধ-ফোটা গলায় বলল, 'বাবা!'

'হ্যাঁ। বাট আই হেট হিম, হেট হিম লাইক এনিথিং। লোকটার সঙ্গে আমার ব্যবহার দেখে নিশ্চয়ই আপনার তা মনে হয়েছে।'

আস্তে মাথা নাড়ল দীপা—হয়েছে।

'কেন নিজের বাবাকে ওভাবে তাড়িয়ে দিলাম জানতে ইচ্ছে হচ্ছে?'

দীপা চোখ নামিয়ে বিব্রতভাবে বলল, 'ওসব কথা থাক।'

রজত বলল, 'নো। তাড়িয়ে দেবার সীনটা যখন দেখেই ফেলেছেন, গোটা ব্যাপারটা আপনার জানা দরকার। নইলে আমার সম্বন্ধে একটা খারাপ ইমপ্রেশান থেকে যাবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না। আসুন আমাদের ফ্ল্যাটে।'

দীপার মনে পড়ল. উমাপতির শরীর খারাপ হয়েছে। যদি নাও আসেন, যে কোন সময় ফোন করতে পারেন। কাজেই ফ্ল্যাট ছেড়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। খানিকটা চিন্তা করে সে বলল, 'আপনিই এ ফ্ল্যাটে আসুন না।' কাল রাত থেকে রজতকে এই নিয়ে বার তিনেক মোটে দেখেছে সে। যেটুকু বুঝতে পেরেছে তাতে তাকে খুব একটা খারাপ মনে হচ্ছে না। হয়ত কিছুটা বদমেজাজী রুক্ষ বা খামখেয়ালী। স্বভাবের মধ্যে নানারকম উল্টোপাল্টা ব্যাপারও রয়েছে, তবু তার দিক থেকে বোধহয় ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। অবশ্য ইতিমধ্যেই এই ফ্ল্যাটে আসার পব তার যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে। যদিও শেষ দুর্ঘটনাটা এখনও স্থগিত রয়েছে, যে কোন সময় সেটা ঘটে যেতে পারে। যার মাথার ওপর নিশ্চিত সর্বনাশ খাঁড়ার মতো ঝুলছে নতুন করে তার আর কতটুকু বিপদ হতে পারে।

রজত বলল, 'ঠিক আছে। একটু দাঁড়ান, আমাদের ফ্ল্যাটটায় তালা লাগিয়ে আসি।'

তালা দিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলো রজত। তাকে নিয়ে ভেতরে যেতে যেতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে দম বন্ধ হয়ে

আসতে লাগল দীপার। হুট করে যদি উমাপতি চলে আসেন ? ঝোঁকের মাথায় রজতকে ফ্ল্যাটে নিয়ে আসা বোধ হয় ঠিক হলো না। কিন্তু এখন আর তাকে ফেরানোও যায় না।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে গলা বাড়িয়ে ফিটফাট-সাজানো বেড-রুম-টুমগুলো দেখছিল রজত। আর বলছিল, 'আপনাদের ফ্ল্যাটটা ফাইন। যে সাজিয়েছে তার আর্টিস্টিক সেন্স আছে। কে সাজিয়েছে বলুন তো ?'

দীপা অস্পষ্ট গলায় কিছু একটা বলল ; বোঝা গেল না।

হঠাৎ কী মনে পড়তে রজত এবার বলল, 'আচ্ছা আপনার সেই আত্মীয়, মানে কালকের সেই এজেড মোটা ভদ্রলোকটিকে দেখছি না তো ?'

রজত উমাপতির কথা জিজ্ঞেস করছে। দীপা ভেতরে ভেতরে আড়ষ্ট হয়ে গেল। উমাপতির প্রসঙ্গ কোনভাবেই সে তুলতে চায় না। কেননা এই নিয়ে নাড়াচাড়া করলে কোন কথায় কী বেরিয়ে পড়বে কে জানে। উমাপতির সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারে একটা মনগড়া ধারণা করে নিয়েছে রজত। ও ভেবেছে উমাপতি তার কোন আত্মীয়-টাত্মীয় হবে। রজত তার ধারণা নিয়ে থাকুক। উমাপতির সঙ্গে তার আসল সম্পর্কটা যে কী, সেটা কিছুতেই বলতে পারবে না দীপা। তবু জিজ্ঞেস যখন করেছে তখন একটা কিছু উত্তর দিতে হয়। দীপা বলল, 'একটু কলকাতার বাইরে গেছেন।'

'কবে ফিরবেন ?'

কখন কবে উমাপতি আসবেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। দীপা বলল, 'আজকালের মধ্যেই—'

রজত বলল, 'ওঁর সঙ্গে কাল রাত্তিরে রুড ব্যবহার করেছিলাম ; এ্যাপোলজি চেয়ে নিতে হবে।'

ওরা ড্রইং রুমে চলে এসেছিল। দীপা বলল, 'বসুন—' তার একবার ইচ্ছা হলো রজতের জন্যে চা করে নিয়ে আসে। যদিও এই ফ্ল্যাটের যাবতীয় খাবারদাবার তারই জন্য মজুদ রয়েছে, খুশিমতো নিজে তা খেতে পারে, অন্যকে খাওয়াতে পারে, বিলোতে পারে কেউ কোনরকম কৈফিয়ৎ চাইবে না। তবু এসব ছুঁতে তার ঘেন্না করে। নেহাত বেঁচে থাকার জন্য সে এখানকার খাদ্যটাদ্য মুখে তুলেছে।

রজত যদি জানতে পারে কোন চড়া দাম গুনে দিয়ে দীপা এত আরামের মধ্যে আছে, সে কি তার দেওয়া চা ছোঁবে? হয়ত মুখে থুতু ছিটিয়ে চলে যাবে। চা খাওয়ানোর ইচ্ছাটা নাকচ করে দিয়ে দীপা রজতের মুখোমুখি একটা চেয়ারে খানিকটা আড়ষ্ট ভাবে বসল।

রজত বলল, 'এত বড় ফ্ল্যাটে আপনি একলা আছেন। আপনাদের ফ্যামিলির অন্য লোকজন কবে আসবেন?'

প্রসঙ্গটা অন্য দিকে ঘোরাতে না পারলে বার বার এই ফ্ল্যাট বা উমাপতির কথা তুলবে রজত। সেটা ভয়ানক অস্বস্তিকর। দীপা বলল, 'আমার কথা পরে শুনবেন। আপনি কিন্তু নিজের কথা বলার জন্যে এসেছেন।'

রজতের মনে পড়ে গেল। ব্যস্তভাবে সে বলল, 'ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, —বলছি।' একটু হেসে বলল, 'আপনার ভীষণ কিউরিওসিটি হচ্ছে তাই না?'

দীপাও হাসল, তবে কিছু বলল না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রজত একসময় শুরু করল। সে যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম। ঐ লোকটা, মানে তার বাবা মোহিনী-মোহন একজন প্রথম শ্রেণীর স্কাউণ্ড্রেল। চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগে স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে সে রজতের মা সুরমাকে বিয়ে করেছিল।

রজতের মামাবাড়ির ফ্যামিলিটা সবদিক থেকে চৌকস। দাদু ছিলেন ফিলজফির অধ্যাপক। তিন মামা ছাত্র হিসেবে ব্রিলিয়াণ্ট। বড় মামা আই-এ-এস হয়ে ডিস্ট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন, মেজমামা এক স্পনসর্ড কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল। ছোটমামা আছেন ফরেন সার্ভিসে—কখনও বেলজিয়াম, কখনও ঘানা, কখনও কানাডা এই করে করে বেড়াচ্ছেন। বড় মাসি আছেন দিল্লীতে, তাঁর স্বামী ওখানকার এক মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। ছোট মাসি বম্বেতে, তাঁর স্বামী ট্রম্বের এ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টারে বড় অফিসার। দুই মাসিই ইউনিভার্সিটির ভালো ছাত্রী।

রজতের মা সুরমা বোনদের মধ্যে মেজো। দুই মাসির মতো তাঁর ইউনিভার্সিটি কেরিয়ার দারুণ ব্রাইট। ম্যাট্রিকুলেশনে মেয়েদের

মধ্যে ফোর্থ হয়েছিলেন, বি-এ অনার্সে হাই সেকেণ্ড ক্লাস, এম-এ -তেও তাই।

এক বান্ধবীর বিয়ের নেমতন্ন খেতে গিয়ে সুরমার সঙ্গে মোহিনীমোহনের আলাপ। বান্ধবীর কীরকম লতায়-পাতায় আত্মীয় সে। সেই আলাপ থেকে বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতা এবং শেষ পর্যন্ত তাদের বিয়েটাও হয়ে গিয়েছিল।

আজকের মোহিনীমোহনকে দেখে বোঝা যাবে না কিন্তু সেদিন সত্যি সত্যি দারুণ সুন্দর চেহারার পুরুষ ছিল সে ; সে কথা বলতে পারত চমৎকার। চেহারা এবং কথা বলার আর্ট—এ দুটোই ছিল তার ক্যাপিটাল। এর জোরেই মামাবাড়ির অতগুলো লোকের, বিশেষ করে ইউনিভার্সিটির এক সেরা ছাত্রী সুরমার চোখে স্রেফ ধুলো দিতে পেরেছিল মোহিনীমোহন। সে জানিয়েছিল কিসের যেন বিজনেস করে। সরল বিশ্বাসে তার কথা মেনে নিয়ে কেউ আর খোঁজখবর নেয় নি। উল্টে প্রচুর খরচ করে সুরমার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু বিয়ের পর মাস কয়েক যেতে না যেতেই টের পাওয়া গিয়েছিল মোহিনীমোহন লোকটা ধাপ্পাবাজ, জুয়াড়ী এবং মাতালও। বিজনেস-টিজনেস কিছুই করে না। ধোঁকা দেবার জন্য বিয়েব আগে এবং পরে কিছুদিন মদটা বন্ধ রেখেছিল।

যখন মোহিনীমোহনের আসল চেহারাটা ধরা পড়ে তখনই সে সুরমাব গয়না-টয়না নিয়ে উধাও হয়ে যায়। কিন্তু দাদু, মা বা মামারা সহজে তাকে ছেড়ে দেন নি। এমনিতেই ধোঁকা দিয়ে বিয়ে করে সে যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। মামারা এবং দাদু পুলিশ লাগিয়ে মোহিনীমোহনকে ধরে এনেছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, এভাবে ধাপ্পা দিয়ে সে বিয়ে করল কেন ?

মোহিনীমোহন দাঁত বার করে দু কান কাটার মতো বলেছিল, 'তা না হলে বড়লোকের অমন ব্রাইট মেয়েকে কি বিয়ে করতে পারতাম ?'

সেই সময় সুরমা প্রেগনাণ্ট। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। পারিবারিক কেলেঙ্কারি আর যাতে না বাড়ে সে জন্য দাদু মাঝামাঝি একটা রাস্তা ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল,

মোহিনীমোহনের চরিত্র শুধরে দিয়ে তাকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একজন সৎ নাগরিক করে তুলবেন। তার জন্য ভালো চাকরির কথাও ভেবেছিলেন দাদু। কিন্তু অন্য কেউ এতে রাজী না; বিশেষ করে মা। সুরমা একদিক থেকে ভীষণ একরোখা আর জেদী। এই নোংরা বাজে বিশ্বাসঘাতক লোকটাকে তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। কাজেই ডাইভোর্সটা হয়ে গিয়েছিল। একটা জোচ্চোর ফেরেববাজ মাতালের ছেলেকে শরীরে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছিলেন সুরমা। সেই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন অনেকখানি কমপ্লেক্স। এমনিতে তিনি ছিলেন দারুণ তাজা প্রাণবন্ত একটি মেয়ে। কিন্তু এই দুর্ঘটনার পর একেবারে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। হাসতেন না, কারো সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলতেন না, প্রায় সব সময় ঘরের ভেতর বসে থাকতেন। হয়ত ভাইবোনদের সুখী উজ্জ্বল জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের তুলনা করে তাঁর মন বিষাদে ভরে যেত। এদিকে মামাদের, মাসিদের কিংবা দাদু-দিদিমার দিক থেকে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। কেউ না কেউ সর্বক্ষণ কাছে কাছে থেকে তাঁকে হাসিখুশি রাখতে চাইতেন।

যাই হোক, এই অবস্থায় রজতের জন্ম। রজত একটু বড় হবার পর সুরমা একটা চাকরি যোগাড় করে নিয়েছিলেন। দাদু বা মামারা আপত্তি করেন নি। চাকরি-বাকরি নিয়ে নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশলে কথা বললে যদি তার মনটা ভালো থাকে!

এইভাবেই চলছিল। রজতও আস্তে আস্তে বড় হচ্ছিল এবং টুকরো টুকরোভাবে মা-বাবার কথা তার কানে এসেছিল। তবে সব কিছু বোঝার বয়স তখন তার নয়।

মোহিনীমোহনকে তখনও দ্যাখে নি রজত। তবে দেখতে ইচ্ছা করত। বাড়িতে বাবার কোন ফোটো ছিল না যে দ্যাখে। ডাইভোর্সের সঙ্গে সঙ্গে তার যাবতীয় স্মৃতিচিহ্ন এ-বাড়ি থেকে আবর্জনার মতো ফেলে দেওয়া হয়েছে। মামাবাড়িতে কেউ তার নাম কোন কারণেও মুখে আনত না। মা সারাক্ষণ এত গম্ভীর আর বিষণ্ণ হয়ে থাকতো যে বাবার কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হতো না। তা ছাড়া রজতের স্বভাবটাও সেই ছেলেবেলায় ছিল চাপা ধরনের। মনে যা-ই থাক সেটা মুখ ফুটে বলতে পারত না।

তবে একটা কথা মনে পড়ে, এই সময় একদিন বাড়ির এক ঝি ঘরে দরজা দিয়ে তাকে মোহিনীমোহনের ছবি দেখিয়েছিল। ছবিটা কোথায় সে পেয়েছিল, কে জানে। রজত বাবাকে চিনেছে ফোটো দেখে।

পনেরটা বছর এভাবে কেটে যাবার পর হঠাৎ একদিন বাতাসে ঝড় তুলে এ বাড়িতে এলেন অজিতেশ। মেজো মামা সুব্রতর বন্ধু তিনি। একসঙ্গে ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত কলেজে পড়েছেন দু'জনে। তারপর মামা জেনারেল লাইনে ফিজিক্স নিয়ে এম· এস-সি পাশ করে ডক্টরেট করেছেন। আর অজিতেশ শিবপুর থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন ওয়েস্ট জার্মানি। একটানা সতের-আঠার বছর সেখানে কাটিয়ে দেশে ফিরে একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট খোলার জন্য প্রথমেই জমি কিনেছেন। গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে লেটার অফ ইনটেণ্ট যোগাড় করে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর পুরনো বন্ধুর খোঁজে এসেছেন।

অজিতেশের হাইট ছ ফুটের ওপারে। গায়ের রঙ পালিশ-করা ব্রোঞ্জের মতো। ব্যাক ব্রাশ-করা তামাটে চুল। মাঝারি চোখ, চওড়া কপাল, খাড়া নাক, সটান মেরুদণ্ড। থুতনিটা চৌকোমতো, দৃঢ় চোয়াল। ভালো বাংলায় 'বৃষস্কন্ধ' বলে একটা কথা আছে; অজিতেশকে দেখলে তক্ষুনি সেটা মনে পড়ে যায়।

দারুণ টগবগে আর হুল্লোড়বাজ মানুষ অজিতেশ। ছুটির দিনে এসেছিলেন। সবাই তখন বাড়িতে রয়েছে। এসেই কারো জন্য অপেক্ষা না করে হৈ চৈ বাধিয়ে নিজেই সবার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন অজিতেশ। জার্মানি যাবার আগে এ বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতেন। দাদু-দিদিমা বা বড় মামাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু মামীরা পরে এ বাড়ি এসেছেন। তা ছাড়া যারা তখন ছোট ছিল তাদেরও চেহারা বদলে গেছে। এতদিন পর তাদের চেনা সম্ভব না। তাই সবার নাম-টাম জেনে, কে কী করছে, জিজ্ঞেস করেছিলেন। সবার শেষে এসেছিল সুরমার পালা। অজিতেশ তাঁর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'সব চাইতে পাল্টে গেছ তুমি। ইউ আর টোটালি চেঞ্জড। অন্যদের তবু একটু আধটু চেনা যায়, তোমাকে একটুও না।'

সুরমা কিছু না বলে সামান্য হেসেছিলেন।

অজিতেশ এবার জিজ্ঞেস করছিলেন, 'কী করছ তুমি?'

সুরমা আধফোটা গলায় বলেছিলেন, 'চাকরি।'

'ধুস। এ দেশে লাইফের যেটা ভাইটাল ব্যাপার তার কী করেছ, সেটা জানতে চাইছি। বিয়েটা হয়েছে?'

সুরমা উত্তর দ্যান নি, তাঁর মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল।

এদিকে গোটা ঘরে ঝপ করে পাথুরে স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। আবহাওয়াটা হঠাৎ বদলে যাওয়ায় অজিতেশের মতো স্মার্ট ঝকঝকে মানুষও খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। সবার মুখের দিকে দ্রুত একবার করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী ব্যাপার বলুন তো?'

বড় মামা বলেছিলেন, 'ব্যাপারটা খুবই ট্র্যাজিক। রুনুর লাইফে একটা এ্যাকসিডেণ্ট ঘটে গেছে।' সুরমার আদরের নাম রুনু।

অজিতেশের মুখচোখ দেখে মনে হয়েছিল, ভীষণ কৌতূহল বোধ করছেন। বলেছিলেন, 'কী হয়েছে।'

খানিকক্ষণ দ্বিধার পর বড় মামা সব ব্যাপার বলে গিয়েছিলেন। এমন কি রজতের কথাও বাদ দ্যাননি। শোনার পর অমন তাজা টগবগে মানুষটা কয়েক মিনিট বিষণ্ন হয়ে ছিলেন। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে গভীর সহানুভূতির গলায় বলেছিলেন, 'স্যাড, ভেরি স্যাড। এতদিন পর দেশে ফিরে রুনুর এরকম একটা খবর শুনব ভাবিনি।'

কেউ এ কথার উত্তর দ্যায় নি।

কিছুক্ষণ পর গা থেকে টোকা দিয়ে ধুলোটুলো ঝাড়ার মতো করে অজিতেশ এবার বলে উঠেছিলেন, এ্যাকসিডেণ্টকে বেশি ইমপর্টান্স দিতে নেই; তা হলেই ওটা পেয়ে বসে।' সুরমাকে বলেছিলেন, 'যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে ভেবে লাইফ নষ্ট করার কোন মানে হয় না। ও চ্যাপ্টার ক্লোজ করে দাও।'

সুরমা বলেছিলেন, 'ক্লোজ তো করেই দিয়েছি।'

'না, করো নি। এ্যাকাউণ্টেনসিতে 'ব্রট ফরোয়ার্ড' বলে একটা কথা আছে। তুমি তেমনি মনে মনে সেই এ্যাকসিডেণ্টটার জের টেনে চলেছ।'

সুরমা বলেছিলেন, 'না-না, বিশ্বাস করুন।'

'কী করে করব! জের না টানলে ষোল বছর আগে যার ডিভোর্স হয়ে গেছে সে আবার বিয়ে করে না?'

'বিয়ে!'

'ইয়েস। ইওরোপ-আমেরিকায় একজনের সঙ্গে আরেকজনের না বনলে মিউচুয়াল সেপারেশন নিয়ে তিন মাসের মধ্যেই আবার আরেকজনকে বিয়ে করে ফেলছে। একেক জন চার পাঁচ কি ছ'বারও বিয়ে করছে। খবরের কাগজে রোজই ওখানে নিউজ বেরোয় 'হী ফর সিক্সথ টাইম, শী ফর সেভেনথ টাইম'। মানে বরের এটি ষষ্ঠ বিবাহ এবং কনের সপ্তম।'

বাড়ির সবাই প্রাণ খুলে হেসে উঠেছিল। সব চাইতে বেশি হেসেছিল সুরমা। ডিভোর্সের পর তাকে এভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে আর কখনও দেখা যায়নি।

মেজো মামা বলেছিলেন, 'তুমি একেবারে ইনকরিজিবল। আগে যেমন ছিলে ঠিক তেমনটিই আছ। নো চেঞ্জ।'

অজিতেশ বলেছিলেন, 'বিলিভ মী, এই রকমটাই ওখানে ঘটছে। যাক গে—' বলতে বলতে সুরমার দিকে ফিরেছিলেন, 'লাইফটাকে নষ্ট করে দিও না রুনু। এর মধ্যেই অনেকগুলো বছর কিন্তু ওয়েস্ট করে ফেলেছ।'

সুরমা আস্তে করে বলেছিলেন, 'কী করব বলুন—'

'কী আবার করবে। নতুন করে লাইফ স্টার্ট কর। এনজয় দা ফান। বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গিয়েছিল অজিতেশের, 'তোমার ছেলেটি কোথায়?'

রজত ঐ ঘরেই ছিল। সুরমা তাকে অজিতেশের কাছে যেতে বলেছিলেন। সে যাওয়ামাত্র আলতো করে তার কাঁধে একটা হাত রেখে অজিতেশ বলেছিলেন, 'ভেরি হ্যান্ডসাম। কী পড়?'

রজত বলেছিল, 'ক্লাস টেনে। আসছে বার হায়ার সেকেন্ডারি দেব।'

'ফাইন। পড়াশোনা ছাড়া আর কী কর? এনি টাইপ অফ স্পোর্টস?'

ভদ্রলোককে মোটামুটি ভালো লেগে গিয়েছিল রজতের। উৎসাহের গলায় সে বলেছিল, 'ফুটবল।'

'আর ?'

'ক্রিকেট।'

'কোথায় খেল ?'

'স্কুল টীমে।'

'গুড।'

'কার খেলা তোমার সব চাইতে ভালো লাগে ?'

'ফুটবলে বেকেনবাউয়ার, ক্রিকেটে সোবার্স।'

'ওদের খেলা কোথায় দেখলে ?'

'সোবার্সের খেলা দেখেছি ইডেন গার্ডেনে, আর বেকেন-বাউয়ারের খেলা টি-ভিতে।'

'আইস-স্কেটিং দেখেছ ?'

'না।'

'শিগগির একদিন এসে তোমাকে দেখিয়ে দেব।'

রজত উত্তর দ্যায় নি।

অজিতেশ আবার বলেছিলেন, 'এর মধ্যে কী সিনেমা দেখেছ ?'

ক্রেজি বয়দের একটা ছবি তখন চলছিল লাইট হাউসে। আগের সপ্তাহে বড় মামা সেটা তাকে দেখিয়ে এনেছিলেন। রজত ছবিটার কথা বলতেই অজিতেশ ঘাড় এবং মাথা নেড়েছিলেন, 'খুব ভালো লেগেছে, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

আরো কিছুক্ষণ এলোমেলো কথা বলে উঠে পড়েছিলেন অজিতেশ, 'অনেকটা সময় চমৎকার কাটলো। এবার যাই।'

দাদু, মামারা, মামীরা, এমন কি সুরমাও খুব আগ্রহের গলায় বলেছিলেন, 'আবার আসবেন।'

'আচ্ছা।'

বাড়ির গেট পর্যন্ত মেজো মামা তাঁকে এগিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। সেখানে অজিতেশের ঝকঝকে নতুন গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। কোন কারণ ছিল না, রজত তাদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল।

গাড়িতে উঠে অজিতেশ যখন স্টার্ট দিতে যাবেন সেই সময়

মেজমামা বলেছিলেন, 'তুমি আসাতে কতদিন পর রুনুটা হাসল। ডিভোর্সের পর কি রকম গুমি হয়ে গেছে যেন। তুমি ভাই সময় পেলে মাঝে মাঝে এসো।'

অজিতেশ বলেছিলেন, বলেছিই তো নিশ্চয়ই 'আসব।'

দিন কয়েক বাদে সত্যি সত্যিই আবার এসেছিলেন তিনি এবং রজতকে আইস-স্কেটিং দেখাতে নিয়ে গেছেন। শুধু রজতকেই না, সুরমাকেও জোর-জার করে সঙ্গে নিয়েছিলেন।

সেই শুরু। তারপর থেকে প্রতি সপ্তাহে দু তিন দিন করে আসতেন অজিতেশ। বাড়ির সবার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প-টল্প করার পর রজত আর সুরমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। সুরমা রোজ যেতে চাইতেন না। কিন্তু অজিতেশ এমন একটি প্রবল প্রাণ-শক্তিওলা মানুষ, যাঁকে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

প্রথম প্রথম রজত সঙ্গে থাকত কিন্তু দু মাস যেতে না যেতেই একা সুরমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন অজিতেশ। প্রচুর জীবনী-শক্তিতে বোঝাই এই তাজা টগবগে মানুষটির মধ্যে এমন কিছু জাদু ছিল যা সুরমাকে আগাগোড়া বদলে দিতে শুরু করেছিল। মোহিনীমোহনের সঙ্গে বিয়ে হবার আগে তিনি যেমন হাসিখুশি আর আমুদে ছিলেন ক্রমশ সে রকমটি হয়ে যাচ্ছিলেন।

এদিকে ভেতরে ভেতরে মামাদের সঙ্গে, মামীদের সঙ্গে, দাদু এবং দিদিমার সঙ্গে অজিতেশের কী একটা গোপন ব্যাপার যেন চলছিল। রজত ঠিক বুঝতে পারছিল না।

মনে আছে, এই সময় এক ছুটির দিনে গোটা বাড়িটায় কেমন যেন এক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিল। মামা, মামী, দাদু বা দিদিমা চাপা নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কী যেন কথাবার্তা বলছিলেন। চারদিকে ব্যস্ততা, ছোটাছুটি। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু রজত সেটা বুঝতে পারছিল না। এর মধ্যেই তার চোখে পড়েছিল মা দারুণ সেজে দাদু এবং দিদিমাকে প্রণাম করে বড় মামা আর মেজো মামার সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

দোতলার সিঁড়ির মুখে রজত দাঁড়িয়ে ছিল। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন মা। দ্রুত মুখ নামিয়ে জড়ানো কাঁপা গলায় বলেছিলেন, 'আমি একটা কাজে যাচ্ছি, দুদিন

ফিরব না। দাদু-দিদা আর মামা-মামীমারা যেভাবে বলেন সেভাবে চলবে।' বলে আর দাঁড়ান নি, তাকান নি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছিলেন।

রজত দৌড়ে দোতলারই রাস্তার দিকের বারান্দায় চলে গিয়েছিল, দেখতে পেয়েছিল দাদুর পুরনো মডেলের ফোর্ড গাড়িতে করে মা আর মামারা চলে যাচ্ছেন।

ঠিক দুদিন বাদে মেজো মামা রজতকে বলেছিলেন, 'চল্, একটু বেরিয়ে আসি।'

মেজো মামা ভীষণ ঘরকুনো টাইপের মানুষ, কলেজ ছাড়া কোনদিন তাঁকে বাইরে বেরুতে দেখা যায় নি। অবাক হয়ে রজত জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোথায় ?'

'চল্ না—'

মেজো মামা ট্যাক্সিতে করে রজতকে দিয়ে পার্ক সার্কাসের একটা বড় বাড়ির তেতলার ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাইরে থেকে কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে যিনি সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি অজিতেশ। বিশাল একখানা হাত বাড়িয়ে রজতকে নিজের বুকের ভেতর টেনে নিতে নিতে বলেছিলেন, 'ওয়েলকাম, মাই সন—'

মেজো মামা কেন যে হঠাৎ অজিতেশের ফ্ল্যাটে তাকে নিয়ে এলেন, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না রজত। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র ; তারপর ভেতরে ঢুকেই চমৎকার সাজানো ড্রয়িংরুমে আসতেই চমকে উঠেছিল। সুরমা সেখানে বসে আছেন। এস্রাজে এলোপাথাড়ি ছড় টানার মতো রজতের বুকের ভেতর কিছু একটা ঘটে যাচ্ছিল। সুরমা তার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেন নি, আস্তে আস্তে উঠে অন্য একটা ঘরে চলে গিয়েছিলেন। আর মেজো মামা অজিতেশকে বলেছিলেন, 'পেঁছে দিয়ে গেলাম। আমি এখন যাই, পরে আসব।'

'ঠিক আছে।' অজিতেশ মাথা নেড়েছিলেন।

মেজো মামা রজতকে এখানে পেঁছে দিয়েই চলে যাবেন, আগে থেকেই তা হলে এ ব্যাপারটা ঠিক করা আছে ? বিমূঢ়ের মতো একবার রজত মেজো মামার দিকে তাকালো। মেজো মামা কোন কথা না বলে আস্তে করে তার মাথায় হাত ছুঁইয়ে চলে গিয়েছিলেন।

অজিতেশ বলেছিলেন, 'বোসো রজত।' রজত বসলে, মুখোমুখি একটা সোফায় বসতে বসতে তিনি বলেছিলেন, আশা করি আমার এখানে তোমার মাকে দেখে সব ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছ।'

রজত বুঝতে পেরেছিল। নিজের অজান্তেই সে মাথা নেড়েছে।

অজিতেশ বলেছিলেন, 'পরশুর আগের দিন আমরা রেজিস্ট্রি করেছি। এ ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না।'

রজতের মনে পড়েছে, পরশুর আগের দিনই মা সেজেটেজে দাদুদের প্রণাম করে বেরিয়ে এসেছিলেন। সেদিন ব্যাপারটা তার কাছে ধাঁধাঁর মতো ছিল।

অজিতেশ আবার বলেছিলেন, 'তোমার সঙ্গে আগেই এ নিয়ে কথা বলা উচিত ছিল কিন্তু তোমার মা বা আমি কেউ তা পারি নি। বুঝতেই পারছ, জিনিসটা ভীষণ ডেলিকেট। এনিওয়ে, যখন ব্যাপারটা হয়েই গেছে তখন ফ্রাংকলি তোমার কাছে সব কিছু এক্সপ্লেন করা দরকার। আফটার অল তুমি বড় হয়েছ।'

রজত চুপ করে থেকেছে। এতদিন অজিতেশ সুরমাকে সঙ্গ দিয়েছেন। হুল্লোড় করে দম বন্ধ গুমোট ভাব উড়িয়ে তাজা ঝরঝরে আবহাওয়া নিয়ে এসেছেন। এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে তার মন সায় দিচ্ছিল না। অথচ মানুষ ভালো অজিতেশ, জীবনে এস্টাব্লিশড, তাঁর মধ্যে কোন রকম নোংরামি নেই! ভেতরটা শক্ত হয়ে উঠেছিল রজতের। সে বলেছে, 'ও সব শুনে কী হবে।'

'তোমার কাছে না বললে আমি ঠিক হাল্কা হতে পারছি না। নিজের কাছে কেমন যেন গিল্টি হয়ে থাকছি। তুমি তো জানো, তোমার মা'র প্রথম ম্যারেড লাইফ হ্যাপি হয়নি—'

'জানি।'

'তোমার বাবার সম্বন্ধে কিছু জানো?'

শুনেছি, হী ইজ এ ব্যাড ম্যান। চীট—'

অজিতেশ সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলেন নি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে শুরু করেছিলেন, 'সুরমা এতগুলো বছর খুবই দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু এভাবে নিজের লাইফটা নষ্ট করা ঠিক না। তাই আমরা ডিসিশন নিলাম, বিয়ে করব। তোমার

মা'র ধারণা এতে সে সুখী হবে, আমার ধারণা তাকে সুখী করতে পারব। এ ব্যাপারে তুমি কী বলো?'

রজত বলেছিল, 'আমি তো ছোট, বড়দের ব্যাপারে কী বলব? আপনারা যা করেছেন, নিশ্চয়ই ভালো বুঝেই করেছেন।'

'অবশ্যই। আমরা সব দিক আগে থেকে ভেবে নিয়েছি। আর সবার আগে যার কথা ভেবেছি সে হচ্ছ তুমি। ঠিক করেছি তুমি, তোমার মা আর আমি এখন থেকে একসঙ্গে থাকব। উই আর এ হ্যাপি ফ্যামিলি। তোমার ফিউচারও আমরা ভেবে রেখেছি। এখান থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িয়ে তোমাকে জার্মানি কি আমেরিকায় পাঠিয়ে দেব।'

হঠাৎ রজত বলেছিল, 'আমার একটা কথা আছে।'

'বল—' খুব আগ্রহ নিয়ে অজিতেশ রজতের দিকে তাকিয়ে-ছিলেন।

'আমি আপনাকে কিন্তু বাবা বলতে পারব না। ছেলেবেলা থেকে কাউকে বাবা বলার হ্যাবিট নেই।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বেশ জোরে জোরেই হেসেছিলেন অজিতেশ। তারপর স্পোর্টসম্যানের মতো বলেছিলেন, 'এ্যাক-সেপ্টেড। তুমি আমাকে মিস্টার মিত্র বলতে পারো।'

সেদিন থেকেই অজিতেশের কাছে থেকে গিয়েছিল রজত। সে যেমন তাঁকে বাবা বলে না, তেমনি মিস্টার মিত্রও বলে না। কিছু বলে ডাকাটা এড়িয়ে যায়।

অজিতেশের কাছে তার কোন রকম অসুবিধা হবার কথা নয়। বাড়িতে পড়বার জন্য দু'জন ভালো টিউটর রেখে দিয়েছিলেন অজিতেশ, রোয়িং আর স্কেটিং ক্লাবে ভর্তি করেছিলেন রজতকে। ভালো খাবার, ভালো পোশাক, ছুটিতে কাশ্মীর কি নৈনিতালে যাওয়া—কোন দিক থেকে তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই বলার ছিল না। তবু ভালো লাগত না রজতের। তার কারণগুলো অন্য জায়গায়।

ছেলেবেলা থেকেই মাত্র একবার ছবিতে দেখা ছাড়া নিজের বাবাকে আর কখনও দেখেনি রজত। মামাবাড়িতে প্রচুর আদর আর আরামের মধ্যে কাটালেও এই ব্যাপারটা নিয়ে তার একটা চাপা গোপন দুঃখ ছিল। মা'র দ্বিতীয় বার বিয়ের পরও আরাম

বা স্বাচ্ছন্দ্য সে কম পায় নি। কিন্তু এখানে এসে রজত একেবারে একা হয়ে গিয়েছিল।

অজিতেশের ছিল প্রচণ্ড এ্যানিম্যাল এনার্জি। জার্মানি থেকে ফেরার পর বি টি রোডে একটা ফ্যাক্টরি খুলেছিলেন তিনি। সেটা নিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়ে থাকতেন এবং এখনও থাকেন। সুরমা দ্বিতীয় বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে অজিতেশের ফ্যাক্টরি নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট সেরে দু'জনে বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন অনেক রাত করে। তখন দু'জনেই মদে চুর। অজিতেশের চরিত্রে ড্রিংক করা ছাড়া আর কোন বাজে ব্যাপার ছিল না। নিজেই শুধু নয়, সুরমাকেও তিনি ড্রিংকটা ধরিয়ে ছেড়েছিলেন। যখন ওঁরা ফিরতেন তখন কথা বলা দূরের কথা, দাঁড়িয়ে থাকার মতো অবস্থা নয়।

সারা দিন রাতে স্কুলের কয়েক ঘণ্টা সময় ছাড়া রজতের কোন সঙ্গী ছিল না। ক্রমশ সে ভীষণ সীনিক হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তাকে ভয়ানকভাবে অবহেলা করা হচ্ছে। এই পৃথিবীতে সে একেবারে ফালতু, তার কোন প্রয়োজন নেই। যে যার নিজেকে নিয়ে আছে। তাকে যে ভালো খাবার, দামী ট্রাউজার্স আর শার্ট, কিংবা নাম-করা ক্লাবে খেলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে তা নেহাতই দয়া করে। কিংবা এসব এক ধরণের ঘুষ।

এই সব ভাবতে ভাবতে হায়ার সেকেণ্ডারির ফল ভীষণ খারাপ করে ফেলল রজত। কোন রকমে থার্ড ডিভিশনে পাশটা করে গিয়েছিল। কাজেই ইঞ্জিনীয়ারিং-এ আর ভর্তি হওয়া গেল না। অজিতেশ উৎসাহ দেবার জন্য বলেছিলেন, 'মন খারাপ করো না, ডোণ্ট বী আপসেট। কলেজে ভর্তি করে দিচ্ছি। জেনারেল লাইনে পড়ে যাও। হায়ার এডুকেশনে রেজাল্ট ভালো করতে পারলে কেরিয়ারের জন্য চিন্তা করতে হবে না।'

রজত কলেজে ভর্তি হয়নি। অজিতেশ তখন তাকে তাঁর ফ্যাক্টরিতে টানতে চেয়েছিলেন। রজত সেখানেও যায় নি। অজিতেশ এবার বলেছিলেন, 'অল রাইট, কী করতে চাও বলো। আমি তার অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে দিচ্ছি।'

রজত উত্তর দ্যায় নি।

এদিকে আরো একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল। তার বাবা মোহিনীমোহন কিভাবে যেন গন্ধ শুঁকে শুঁকে সেই ফ্ল্যাটে এসে হাজির হয়েছিল। মামাবাড়ির এক ঝি দরজায় খিল আটকে অনেককাল আগে যে সুপুরুষ যুবকটির ছবি তাকে দেখিয়েছিল তার সঙ্গে এই লোকটির মিল ঠিকই আছে কিন্তু এর চেহারা আগাগোড়া পোকায় খাওয়া, স্বাস্থ্য বলতে কিছুই নেই। নোংরা তালি-মারা জামা-কাপড়, মুখে আলপিনের মতো দাড়ি। এসেই প্রথম কথা যা সে বলেছিল তা এই রকম, 'তুমি নিশ্চয়ই রজত।' বোঝা গিয়েছিল খোঁজখবর নিয়েই সে এসেছে। তার মুখ থেকে ভক ভক করে তাড়ির গন্ধ বেরিয়ে আসছিল। চোখদুটো হাঁসের ডিমের মতো বড় বড় ; ভেতরকার মণি ঘোলাটে।

রক্তমাংসের চেহারায় নিজের বাবাকে সেই প্রথম দেখেছিল রজত। কিন্তু ফুটন্ত দুধের মতো কোন আবেগ বুকের ভেতর উথলে ওঠেনি। বরং দেখামাত্র জোচ্চোর বিশ্বাসঘাতক লোকটাকে ঘেন্না করতে শুরু করেছিল সে।

মোহিনীমোহন ধানাই পানাই করে অনেক কথা বলে গিয়েছিল। সে সব মনে নেই রজতের। তবে যাবার সময় দশটা টাকা একরকম কেঁদেকেটেই চেয়ে নিয়েছিল। সেই আরম্ভ।

এদিকে কয়েক বছরে অজিতেশের ফ্যাক্টরি অনেক বড় হয়েছে। হুড় হুড় করে টাকা আসছিল তাঁদের। পার্ক সার্কাসের বাড়ি ছেড়ে সাদার্ন এ্যাভিনিউর এই 'পশ্' এরীয়াতে বিরাট ফ্যাশনেবল ফ্ল্যাট কিনে চলে এসেছেন তাঁরা। মোহিনীমোহন ঠিক খুঁজে খুঁজে এখানেও হানা দিয়েছে। সুরমা আর অজিতেশ যখন থাকেন না। সেই ফাঁকটায় সে রজতের কাছে আসে। তাড়ি বা ধেনো মদের জন্য কয়েকটা টাকা আদায় না করে নড়ে না।

রজত তাড়িয়ে দ্যায়, নির্লজ্জ ইতর লোকটা দু-দিন পরই আবার দাঁত বার করে এসে হাজির হয়। এইভাবে চলছে।

কথা শেষ করে রজত বলল, 'এই হলো আমার অটোবায়োগ্রাফি। এবার বলুন ওই লোকটাকে, আই মীন নিজের বাবাকে ঘেন্না করার রাইট আমার আছে কিনা।'

সেণ্টার টেবলের ওধারে বসে শুনতে শুনতে নিজের কথা,

ভাইবোন বা মায়ের কথা, উমাপতির কথা, এমন কি এই ফ্ল্যাটে যে জন্য এসে আছে সেকথাও ভুলে গিয়েছিল দীপা। রজতের জন্য এক ধরনের সহানুভূতিতে তার বুকের ভেতরটা ভরে যাচ্ছিল। সে কোন উত্তর না দিয়ে তাকালো কিন্তু রজতের মুখ স্পষ্ট দেখা গেল না। সেই বিকেলবেলা এই ফ্ল্যাটে এসেছিল রজত। তখন নরম সোনালি রোদে চারদিক ভেসে যাচ্ছে। তারপর কে যে কখন অদৃশ্য লাটাইতে সেই রোদটুকু গুটিয়ে নিয়েছে আর কখন সন্ধ্যা ধোঁয়াটে রঙের ব্রাশ টেনে টেনে সব কিছু ঝাপসা করে দিয়েছে কেউ টের পায়নি।

দীপা উঠে গিয়ে আলো জ্বালিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রজতের খেয়াল হলো যেন। বলল, 'আরে বাব্বা, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কতক্ষণ ধরে ভ্যাজোর ভ্যাজোর করছি! চলি এখন—' বলতে বলতে উঠে বাইরে যাবার প্যাসেজের দিকে এগিয়ে গেল।

দীপা একবার ভাবলো, রজতকে আরো খানিকক্ষণ থাকতে বলে। কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা হচ্ছিল তার। কিন্তু এতক্ষণ পর আবার উমাপতির মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তা ছাড়া কামিনীরও ফেরার সময় হয়েছে।

দরজা খুলে রজত সবে বেরিয়েছে। আর দীপা পাল্লার গায়ে আলতো করে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই সময় করিডরের শেষ মাথায় প্রায় একই সঙ্গে দুটো লিফট্ এসে থামল। একটা লিফট্ থেকে একজন দারুণ স্মার্ট চেহারার মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। দু'জনেই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ওঁদের কারো পা-ই স্বাভাবিকভাবে পড়ছিল না। তবে মহিলাটির অবস্থা খুবই খারাপ। ভদ্রলোকের কাঁধে মাথা রেখে টলতে টলতে এগিয়ে আসছিলেন। ভদ্রলোক হঠাৎ রজতকে দেখে জড়ানো গলায় বললেন, 'রজত, প্লীজ কাম। তোমার মাকে একটু ধর। আজ ড্রিংকটা একটু বেশি করে ফেলেছে।'

দীপা বুঝতে পারল, ওঁরা অজিতেশ আর সুরমা।

রজত খুব একটা ব্যস্ততা দেখাল না, আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সুরমার একটা হাত এবং শরীরের কিছুটা অংশের ভার ভাগাভাগি করে নিজেদের ফ্ল্যাটের দিকে চলে গেল।

দু নম্বর লিফট্‌টা থেকে বেরিয়ে এসেছিল কামিনী। দীপা তাকে এক পলক দেখেছিল ঠিকই, তবে তেমন ভালো করে লক্ষ্য করে নি। তার চোখ ছিল রজতদের দিকে। সে যখন রজতদের দেখছে সেই সময় কামিনী কখন যেন কাছে চলে এসেছিল। এবার সে বলল, 'ভেতরে চলুন দিদিমণি—'

দীপা চমকে উঠে বলল, 'হ্যাঁ, চল। হাওয়া খাওয়া হলো?'

দীপা আগে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছিল। তারপর কামিনী ভেতরে এসে দরজায় ছিটকিনি আটকাতে আটকাতে বলল, 'হ্যাঁ। আচ্ছা দিদিমণি!'

'কী?'

'ঐ জোয়ানবাবুটা বুঝি পাশের ফেলাটের?'

দীপার বুকের ভেতর আচমকা একটা ধাক্কা লাগলো যেন। সে বুঝতে পারছিল, রজতের কথা বলছে কামিনী। বুঝেও জিজ্ঞেস করল, 'কার কথা বলছ?'

ওরা ড্রইং রুমের কাছে চলে এসেছিল। কামিনী বলল, 'ঐ যে বাবুটা –আমাদের এই ফেলাট থেকে বেরিয়ে গিয়ে মাতাল মেয়েমানুষটাকে নিয়ে পাশের ফেলাটে ঢুকল।'

কামিনী তা হলে দেখে ফেলেছে। ধরা যখন পড়ে গেছেই তখন আর চোর-পুলিশ খেলার মানে হয় না। দীপা জানালো ছেলেটা পাশের ফ্ল্যাটেরই।

'দাঁড়ান, কাপড় চোপড় ছেড়ে এসে কথা কইচি।'

শাড়ি-টাড়িই বদলালো না কামিনী, কিচেন থেকে দু কাপ চা-ও করে আনলো। তারপর মুখোমুখি বসে বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলের মতো উল্টোপাল্টা জেরা শুরু করে দিল।

'বাবুটাকে আপনি আগে থেকেই জানতেন?'

'না।' আড়ষ্ট গলায় দীপা বলতে লাগল, 'এখানে এসে দেখেছি।'

কামিনী বলল, 'দেখতে খুব সোন্দর, না?'

দীপা উত্তর দিল না।

কামিনী খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর রহস্যময় হেসে বলল, 'আপনি একটা কাজের কাজ করেছেন গো দিদিমণি।'

দীপা জিজ্ঞেস করল, 'কী করেছি ?'

'ঐ বাবুটার সনুগে ভাব করে ফেলেছেন। এমন জোয়ান সোন্দর লাভার হাতছাড়া করবেন না দিদিমণি।

দীপার কানের লতি গরম হয়ে উঠল। সে বলল, 'কী যা তা বলছ !'

কামিনী বলল, 'ভালবাসা হলো গে পারার ঘা, গায়ে ফুটে বেরুবেই। আমার চোখে ধুলো ছিটনো সহজ লয় দিদিমণি। মুখ দেখলেই আমি বুঝতে পারি।

এরপর আর কী বলবে দীপা। সে যাই বলুক না, কামিনীকে বিশ্বাস করানো শক্ত। সে একটা মনগড়া ধারণা করে নিয়েছে। সেটা ধরেই বসে থাকবে।

কামিনী আবার বলল, 'ঐ বুড়ো ভামটা, মানে আমাদের উমাপতিবাবু গো ; তাকে তো আর ভালোবাসা যায় না। মানুষকে পেটের জন্যে কত কী করতে হয়। ধরুন না, ঐ ঘাটের মড়াটার কাছে আপনি চাকরি করছেন।'

কামিনী থামেনি। একদমে দারুণ হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো সে বলে যেতে লাগল, 'আবার বলছি ঐ ছোকরাকে ছাড়বেন না, নাকে বঁড়শি বিঁধিয়ে আটকে রাখবেন। ভগবানের দয়া হলে ওর হাত ধরেই এই লরক থিকে বেরিয়ে যেতে পারবেন।'

দীপা এবারও উত্তর দিল না।

কামিনী কী ভেবে ফের বলল, 'ছ-সাত বছর আগে আমি এক বুড়ো গুজরাটিবাবুর রক্ষিতার কাছে কাজ করেছিলাম। মেয়েমানুষটির বয়েস কম, যুবতী। পেটের দায়ে বুড়োর কাছে থাকত। কিন্তুন ভেতরে ভেতরে ভালোবাসত এক ছোকরাকে। সে-ই তাকে ওখান থিকে একদিন বার করে নিয়ে গেল। এখন তারা সুখে আছে, ঘরকন্না করছে।'

কামিনীর আর কোন কথা শুনতে পাচ্ছিল না দীপা। রক্ষিতা শব্দটা তার কানে ছুঁচের মতো বিঁধে গেল। এর আগে সেই সকালবেলায় একবার সে বলেছিল—মেয়েমানুষ। শব্দদুটো দীপার রক্তমাংসের ভেতর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিতে লাগল যেন। চোখমুখ ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল।

নয়

সন্ধ্যেটা বেশ গাঢ় হয়েই এতক্ষণে নেমে এসেছে। খানিকটা আগেই রাস্তায় রাস্তায় কর্পোরেশনের আলোগুলো জ্বলে উঠেছিল। দক্ষিণ বজবজের রেল লাইন, তার ওধার থেকে উল্টোপাল্টা আরামদায়ক হাওয়া হু-হু করে ছুটে আসছে।

কাল রাত্তিরে দীপাকে সাদার্ন এ্যাভেনিউর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবার সময় সেই যে খিঁচ ব্যথাটা শুরু হয়েছিল আজ দুপুর পর্যন্ত তাতে কাবু হয়ে ছিলেন উমাপতি। কিন্তু এখন আর ব্যাথাটা নেই। দুপুরবেলা রোজ দু-খানা আলুনি আটার রুটি আর ভেজিটেবল এবং মাছের সুপ-টুপ খান। আজ প্রভাবতী তাঁকে এক গেলাস বার্লি দিয়েছে। ফলে শরীরটা একটু দুর্বল মনে হচ্ছে, তবে ব্যথাটা না থাকার জন্য বেশ কিছুটা ঝরঝরেও লাগছে।

অন্যদিন বিকেল হলে প্রভাবতীকে নিয়ে ময়দান কি ইডেন গার্ডেনের দিকে একপাক ঘুরে আসেন উমাপতি। শরীর খারাপের জন্য আজ প্রভাবতী তাঁকে নিয়ে বেরোয় নি। তবে ঠিক করা আছে, পরমেশ এলে তিনি একবার বেরুবেন। পরমেশ যা-ই করুন না, তাতে প্রভাবতীর আপত্তি নেই। যে লোক কয়েক লাখ টাকা পাইয়ে দ্যায় তার সাত খুন মাপ।

প্রভাবতী অবশ্য জানে উমাপতি পরমেশের সঙ্গে ক্লাবে যাবেন। আসলে পরমেশ তাঁকে নিয়ে যাবেন একজন স্পেশালিস্টের কাছে। লাইফকে যাতে এনজয় করা যায় সে জন্য তিনি উমাপতির শরীরে খানিকটা এনার্জি পুরে দেবেন।

এই মুহূর্তে উমাপতির পরনে ঢলঢলে এক বগ্গো ট্রাউজার, যেটার কাঁধের ওপর দিয়ে গালিস আর ডবল কাফ দেওয়া পুরনো স্টাইলের ফুল শার্ট। পকেট-ওয়াচটা শার্টের পকেটে বোতামের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। নাকের ওপর গোল বাই-ফোকাল চশমা। মাথার চুল সিঁথির দুধারে পাট করে আঁচড়ানো। একেবারে সেজেগুজে

ফিটফাট হয়ে খাটের ওপর বসে আছেন উমাপতি, পরমেশ এলেই বেরিয়ে পড়বেন।

দশ ফুট দূরে মেঝেতে বসে প্রভাবতী পান সেজে সেজে একটা বড় স্টেনলেস স্টীলের কৌটো বোঝাই করছে। উমাপতি পানটা একটু বেশি খান। তিনি ক্লাবে বেরুবার সময় রোজ ঐ কৌটটায় কুচো সুপারী, এলাচ, লবঙ্গ অরে গাদা গাদা পানের খিলি ভর্তি করে দ্যায় প্রভাবতী। সে তো আর জানে না এত পান মুখ থেকে কিসের গন্ধ মারার জন্য দরকার হয়।

আগে থেকেই ঠিক করা আছে, উমাপতি বেরুবার পর প্রভাবতী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ময়দানের দিকে একটু ঘুরে আসবে। পয়সা হবার পর গাড়ি কিনে এই এক খারাপ অভ্যাস হয়ে গেছে। বিকেলের দিকে একবার বেরুতে না পারলে ভালো লাগে না। মনে হয়, সারাদিনের সব চাইতে জরুরী কাজটাই হলো না। খোলা মাঠের হাওয়া না খেলে গা যেন ঢিস ঢিস করতে থাকে।

পান সাজতে সাজতে প্রভাবতীর মুখও চলছিল, 'আজ ক'টায় ফিরবে?'

উমাপতি ভয়ে ভয়ে বললেন, 'তাড়াতাড়িই ফিরব।'

'সাড়ে ন'টার বেশি এক মিনিট দেরি হলে আজ আর রক্ষে থাকবে না।'

উমাপতি মনে মনে ভাবলেন, কাল যেন কত রক্ষে থেকেছিল। এক ডজন নতুন কাঁচের গেলাস, একটা ট্রানজিস্টর, দামী কিছু ক্রকারি কাল গেছে। আজ কী হতে পারে, সেটা চিন্তা না করাই ভালো। মিনমিনে গলায় উমাপতি বললেন, 'দেরি হবে না।'

'আজ যদি খিঁচ ব্যথা আর বেশি ব্লাড প্রেসার নিয়ে ফেরো—'

প্রভাবতীর কথা শেষ হবার আগেই উমাপতি বলে উঠলেন, 'না-না। ও সব কিছু হবে না।'

'মনে থাকে যেন।'

'থাকবে।'

একটু চুপ করে থেকে প্রভাবতী এবার বলল, 'হরিদ্বারে গুরুদেবের আশ্রমে টাকা পাঠিয়েছ?'

বছর কয়েক আগে উমাপতি যখন দেশের প্রপার্টির জন্য

কমপেনসেশন পাননি সেই সময় স্ত্রীর সঙ্গে ট্রেনের থার্ড ক্লাসে চড়ে হরিদ্বারে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে এক গুরুর খোঁজ পেয়ে এবং তাঁর কিছু অলৌকিক কাণ্ডকারখানার কথা শুনে দুজনেই দীক্ষা নিয়ে বসেছিলেন। সেই থেকে মাসে মাসে গুরু-দেবের আশ্রমে কিছু কিছু প্রণামী পাঠিয়ে আসছেন উমাপতি। দেশের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ পাবার পর প্রভাবতীর চাপে প্রণামীটা দশগুণ করে দিতে হয়েছে। ওর হয়ত ধারণা গুরুদেবের প্রণামী যত বাড়ানো যাবে তাঁদের এ্যাকাউণ্টে ঠিক ততখানিই পুণ্য জমা পড়বে। উমাপতি বললেন, 'কাল পরশু পাঠিয়ে দেব। মনে ছিল না—'

বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল প্রভাবতী, 'তা কেন মনে থাকবে। রোজ পেণ্টুল পরে ক্লাবে যেতে তো ভুল হয় না।'

উমাপতি উত্তর দিলেন না। একটা কথা মনে পড়তে তিনি চ্যাপলিন-মার্কা গোঁফের তলা দিয়ে ফিক করে হেসে ফেললেন। এখন তিনি চলেছেন জীবনের আনন্দ লুটবার জন্য স্পেশালিস্টের কাছে এনার্জির খোঁজে। আর এই মুহূর্তে কিনা প্রভাবতী পরলোকের কথা ভেবে ক্ষেপে উঠেছে।

হাসিটা দেখতে পেয়েছিল প্রভাবতী। তার ভুরু কুঁচকে গেল। তীক্ষ্ন ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'হাসলে যে?'

উমাপতি ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'কই না তো?'

'হেসে আবার বলছ হাসোনি?' প্রভাবতীর গলা আরো কয়েক পর্দা চড়ে গেল।

'মা কালীর দিব্যি, হাসি নি। মুখটা কুঁচকে গিয়েছিল বোধ হয়।'

'কোনটা মুখ কোঁচকানো আর কোনটা হাসি, আমি বুঝি না? আমি কোলের মেয়ে। নাক টিপলে আমার দুধ বেরোয়?'

কোলের মেয়ে শুনেই প্রভাবতীর দেড় কুইণ্টাল ওজনের বিশাল শরীরটার দিকে চোখ চলে গিয়েছিল উমাপতির। আবার তাঁর পেটের ভেতর থেকে বগবগিয়ে হাসি উঠে আসছিল। অনেক কষ্টে ঠোঁট টিপে সেটা আটকালেন।

প্রভাবতী দুই চোখে ছুরির মতো শান দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে

রইল। তারপর আবার পান সাজায় মন দিল। সাজতে সাজতে এবার বলল, 'অনেকদিন তীর্থ করা হয়নি। ভাবছি আসছে মাসে তিরুপতি যাব।' বলতে বলতেই সরোদে ঝালা তোলার মতো গলার স্বর চড়ায় তুলে ঝড়ের বেগে বলতে লাগলো, 'শরীরটা আবার খারাপ করে বোসো না।' চিরকাল দেখে এসেছি যখনই কোথাও যেতে চাইব, অমনি একটা কিছু বাধিয়ে বাগড়া দিচ্ছ। এবার যদি তেমন কিছু করো ঐ অবস্থাতেই হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যাব। আমার শরীর-স্বাস্থ্যের যা হাল, আর কতদিন তীর্থধর্ম করতে পারব, জানি না।'

কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে বলেননি প্রভাবতী। এর আগেও বার কয়েক তীর্থে বেরুতে যাবার মুখে অসুখে পড়েছিলেন উমাপতি। যাই হোক, এবার দীপার কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। মেয়েটাকে এই সবে এনে সাদার্ন এ্যাভেনিউতে তুলেছেন। এ মাসের আর ক'টা দিনই বা বাকি। আজ নিয়ে চারদিন। আসছে মাসে তিরুপতি যেতে হলে দীপার একটা ব্যবস্থা করতে হয়। তাকে ফ্ল্যাটে রেখে হুট করে কলকাতার বাইরে চলে যাওয়া ঠিক না। কখন কী ঘটে যাবে, তখন তাঁকে নিয়ে টানাটানি। কলকাতায় থাকলে ছোটাছুটি করে একে-ওকে ধরে সামলানো যায় কিন্তু দূরে গেলে খুবই বিপদ। মাথাভর্তি দুশ্চিন্তা নিয়ে তীর্থ করতে যাওয়া যায় না। উমাপতি বারকয়েক ঢোক গিলে বললেন, 'আসছে মাসেই যাবে?'

'আমি কি তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছি?' পান সাজা হয়ে গিয়েছিল। কুচোবার জন্য একটা সুপুরি জাঁতির ভেতর ফেলে খটাং করে দু খণ্ড করে ফেলল প্রভাবতী।

'না, বলছিলাম কি—'

'কী?'

'আসছে মাসে না গিয়ে যদি যাওয়াটা আরেকটু পিছিয়ে দিতে—'

'জানি, ঠিক একটা বাগড়া পড়বে। লোকে ভালো কাজ, পুণ্যের কাজ আগে করে। এর একেবারে উল্টো।'

উমাপতি কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় চাকর এসে খবর

দিল পরমেশ একতলার ড্রইং রুমে বসে আছেন, এখন আর ওপরে উঠবেন না, উমাপতিকে নিচে যেতে বলেছেন।

তিরুপতির ব্যাপারটা আপাতত মুলতুবী রইল। উমাপতি কিছুক্ষণ পর পানের ঢাউস কৌটা পকেটে পুরে নিচে নেমে এলেন।

দশ

আরো এক ঘণ্টা বাদে দেখা গেল, উমাপতি আর পরমেশ সেণ্ট্রাল ক্যালকাটার একটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এর তেরো তলায় একজন স্পেশালিস্টের চেম্বারে বসে আছেন। উল্টোদিকের চেয়ারে স্বয়ং স্পেশালিস্ট। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, ঝকঝকে চেহারা। তাঁর প্র্যাকটিশ যে দারুণ ভালো তার প্রমাণ চেম্বারের এয়ারকুলার, ধবধবে পোশাকপরা পার্শী কি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স, দামী চেয়ার-টেবল, মেঝের কার্পেট, ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্পেশালিস্টের নাম ডাক্তার সন্দীপ সেন। তিনি উমাপতিকে এক পলক দেখে পরমেশের দিকে ফিরলেন, 'এঁর কথাই বলেছিলেন?'

বোঝা গেল, আগেই উমাপতির সম্বন্ধে ডাক্তার সেনের সঙ্গে পরমেশের কথা হয়েছে এবং ওঁরা পরস্পরের পরিচিত। পরমেশ মাথা নেড়ে জানালেন, 'হ্যাঁ। এরই যুবকদের মতো এনার্জি দরকার।'

ডাক্তার সেন সামান্য হাসলেন। তারপর বললেন, 'এঁকে একটু ভাল করে দেখা দরকার।' উমাপতিকে বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে—'

এই চেম্বারটার পেছন দিকে চমৎকার করে সাজানো আরেকটা চেম্বার রয়েছে। সেখানে উঁচু বেডে উমাপতিকে শুইয়ে তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব পরীক্ষা করলেন। তারপর এ যাবৎ যে সব অসুখে তিনি ভুগেছেন এবং নিয়ম করে ভুগে চলেছেন, যা-যা ওষুধ

খেয়েছেন এবং খেয়ে চলেছেন, প্রশ্ন করে করে তারা ধারাবাহিক ইতিহাস শুনলেন। একটি দারুণ সুন্দর চেহারার স্মার্ট যুবতী—স্পেশালিস্টের পার্সোনাল এ্যাসিস্টাণ্ট সে—পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুঁটিনাটি নোট নিয়ে গেল।

তারপর উমাপতিকে নিয়ে আগের বড় চেম্বারটায় ফিরে এলেন ডাক্তার সেন। সেখানে পরমেশ অপেক্ষা করছিলেন।

পরমেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখলেন ডাক্তার সেন?'

'শরীরে কিছু নেই। যেখানে হাত দিয়েছি সব টোটালি ড্যামেজড। এই অকেজো বডি নিয়ে কী করে চালাচ্ছেন সেটাই একটা ওয়াণ্ডার।'

'তাই নাকি?'

'ইয়েস।'

'তা হলে?'

ডাক্তার সেন বললেন, 'ওর কিডনিটা চেঞ্জ করে নতুন কিডনি বসানো দরকার।'

পরমেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'আর?'

'হার্ট আর ডান চোখটাও বদলে ফেলতে পারলে ভালো হয়। আই ব্যাঙ্ক থেকে চোখ হয়ত পেয়ে যাবেন। মিস্টার সমাদ্দারের তো অনেক টাকা বলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ফরেন থেকে কোন নিগ্রোর হার্ট আর কিডনি আনাতে পারলে ভালো হয়।'

'আর?'

'শরীরটা ভীষণ লুজ হয়ে গেছে। ফ্লেশের টিস্যুতে কিছু আর নেই। কিডনি টিউনিগুলো পাল্টাতে পারলে কাজ হবে।'

'আপনি যা বলছেন তাতে শরীরের সব পার্টসই তো চেঞ্জ করে ফেলতে হয়।

মজা করে ডাক্তার সেন বললেন, 'একজাক্টলি। তা হলে মিস্টার সমাদ্দার একেবারে নতুন মডেলের মানুষ হয়ে যাবেন। এ পারফেক্ট লাইভলি ইয়াং ম্যান—'

শরীরের এতগুলো অংশ একসঙ্গে বদলে সেগুলোর জায়গায়

অন্য মানুষের পার্টস এনে বসাবার কথা শুনতে শুনতে চমকে চমকে উঠছিলেন উমাপতি। জামার তলায় বিন বিন করে ঘাম ফুটে উঠছিল। গলার ভেতরটা শুকিয়ে ব্লটিং পেপারের মতো হয়ে যাচ্ছিল। ঢোক গিলে তিনি হঠাৎ বললেন, 'আমার চোখ, আমার কিডনি, আমার হার্ট বাদ দিয়ে নতুন কিডনি-টিডনি বসাতে হলে অপারেশন করতে হবে?'

ডাক্তার সেন বললেন, 'অপারেশন তো করতেই হবে মিস্টার সমাদ্দার।'

'কিন্তু অপারেশনে আমার ভীষণ ভয় ডাক্তারবাবু।'

'কোন ভয় নেই।'

কাঁপা গলায় উমাপতি বললেন, 'অপারেশন ছাড়া অন্য কোন-ভাবে হয় না?'

ডাক্তার সেন বললেন, 'নতুন মডেলের শরীর চাইছেন, একটু আধটু কাটা ছেঁড়া তো করতেই হবে। নার্ভাস হবেন না, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

ডাক্তারের পার্সোনাল এ্যাসিস্টান্ট সুন্দরী যুবতীটি এই চেম্বারে আসে নি। পরমেশ গলা নামিয়ে বললেন, 'অতগুলো পার্টস চেঞ্জ করতে সময় লাগবে। কিডনি, হার্ট, চোখ যোগাড় করা কম ট্রাবলসম নাকি?'

'সে তো বটেই—'

'একটা টেম্পোরারি ব্যবস্থা করুন ডাক্তার সেন। আপনাকে আগেই জানিয়েছি, মেয়েটাকে অলরেডি নিয়ে আসা হয়েছে। মানে, বুঝতেই পারছেন—' বলে চোখ কুঁচকে অদ্ভুত একটু হাসলেন পরমেশ।

ডাক্তার সেন এবার যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে জন্যে আপনাদের ভাবতে হবে না। মিস্টার সমাদ্দার যাতে লাইফ এনজয় করতে পারেন তার ব্যবস্থা করছি। রোজ একটা করে ইঞ্জেকশন নিতে হবে, আর ট্যাবলেট দেব। ইঞ্জেকশনটা নিলে বডিতে টেন হর্স পাওয়ারের এনার্জি এসে যাবে।'

উমাপতি ভয়ে ভয়ে বললেন, ডাক্তারবাবু, প্রেসারের জন্যে, সুগারের জন্যে, কিডনির ট্রাবলের জন্য আমি যে রোজ ওষুধ

খাচ্ছি। তার ওপর আপনার ওষুধ আর ইঞ্জেকশন চাপালে কিছু হবে না তো?'

'না-না, কিছু হবে না।' ডাক্তার যেন খস খস করে প্রেসক্রিপসন লিখে ফেললেন।

এয়ার-কুলার বসানো ঘরে বসেও নার্ভাস উমাপতি ঘেমে নেয়ে যাচ্ছিলেন। বললেন, 'ইঞ্জেকশন তো নিতে পারব না ডাক্তারবাবু—'

'কেন?'

'আমার স্ত্রীকে আপনি দ্যাখেন নি, তার দু হাজার চোখ। সে যদি জানতে পারে হাউস ফিজিসিয়ানের ওষুধের ওপর আপনার ইঞ্জেকশন নিচ্ছি, স্রেফ আমার ডেড বডির ওপর রক্ষে কালী হয়ে নাচবে।'

ডাক্তার সেন একটু ভেবে বললেন, 'বাড়িতে নেবার দরকার কী, বাইরে কোথাও নিয়ে নেবেন।'

পরমেশ বললেন, 'সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে তোমার ইঞ্জেকশন নেবার ব্যবস্থা করে দেব।'

ডাক্তার সেন বললেন, 'আজকের ইঞ্জেকশনটা আমিই দিয়ে দিচ্ছি। তবে ট্যাবলেটটা বাড়িতে ঘুমের আগে খেতে হবে। স্ত্রীকে লুকিয়ে খেতে পারবেন তো?'

উমাপতি ভয়ানক ভীতু গলায় বললেন, 'চেষ্টা করে দেখব।'

ইঞ্জেকশন নেবার পর ডাক্তার সেনের চেম্বার থেকে বেরিয়ে লিফটে করে নিচে নেমে এলেন ওঁরা। সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। দুজনে উঠতেই ট্যাক্সিওলা জানতে চাইল, 'কাঁহা যানা সাব?'

উমাপতি পরমেশের দিকে ফিরে বলল, 'ক্লাবে যাবে তো? সেখানে যেতে বলি?'

পরমেশ বললেন, 'তুমি একেবারে ওয়ার্থলেস।'

উমাপতি ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলেন, 'কেন, কেন?'

'সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে বসে বীয়ার খাবার জন্যে ঐ রকম একটা ইয়াং গার্লকে দেড় লাখ টাকার ফ্ল্যাটে তুলেছ নাকি? এখন ইঞ্জেকশনটাই বা নিলে কী করতে?' বলেই ড্রাইভারের দিকে ফিরলেন, 'সাদার্ন এ্যাভেনিউ চলিয়ে—'

উমাপতি কিছু বললেন না। তিনি জানেন আপত্তি করে লাভ নেই। খানিকটা যাবার পর হঠাৎ তাঁর মনে হলো শরীরটা বেশ তাজা আর চনমনে লাগছে। অনেক কাল নিজেকে এ রকম ঝরঝরে মনে হয় নি তাঁর। আচমকা যেন এক লাফে তিরিশটা বছর পার হয়ে সোজা যৌবনে ফিরে যেতে লাগলেন। বুঝতে পারছিলেন, ডাক্তার সেনের ইঞ্জেকশন তাঁর চুয়ান্ন বছরের বাসী রক্তে আগুনের হল্কার মতো কিছু ছড়িয়ে দিচ্ছে।

এই সময় পরমেশ ডাকলেন, 'উমাপতি—'

উমাপতি তক্ষুনি সাড়া দিলেন, 'বল।'

'কী রকম লাগছে? নিশ্চয়ই খুব ফ্রেশ ফিল করছ।'

'তুমি কী করে জানলে?'

'ঐ ইঞ্জেকশনটা আমিও অনেকবার নিয়েছি। যাক, তোমার তা হলে ভালো লাগছে?'

'খুব।'

গাড়িটা সাদার্ন এ্যাভেনিউতে সেই হাই-রাইজ বিল্ডিং-এর কাছে চলে এসেছিল। পরমেশ ট্যাক্সি থামিয়ে বললেন, 'উমাপতি, গো এ্যান্ড এনজয় দি চার্ম অফ লাইফ।'

ট্যাক্সি থেমে নামতে নামতে উমাপতি বললেন, 'তুমি আসবে না?'

পরমেশ বললেন, হিন্দিতে 'কাবাবমে হাড্ডি' বলে একটা কথা আছে। কাবাবের ভেতর আমার মতো একটা হাড় ঢোকালে ভালো লাগবে না। একটা কথা, আমার সেই কুড়ি হাজার টাকার ব্যাপারটা ভুলে যেও না কিন্তু—'

'ভুলি নি, কাল নিয়ে নিও।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, আবার দেখা হবে।' ট্যাক্সি নিয়ে পরমেশ চলে গেলেন। আর বিশাল বাড়িটার ভেতর এসে লিফট্ বক্সে ঢুকে পড়লেন উমাপতি। বোতাম টিপতেই একটানা ঝিঁঝির মতো শব্দ করে লিফ্টা ওপরে উঠে এল।

এগারো

দু মিনিট পর দেখা গেল, উমাপতি থারটীনথ ফ্লোরে তাঁর সেই ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেল টিপছেন।

একটু পর দরজা খুলে কামিনী দারুণ খাতিরের গলায় বলল, 'আসুন বাবু, আসুন—' বলেই ভেতর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'দিদিমণি, দেখুন কে এয়েছেন—'

দীপা ড্রয়িং রুমের দিক থেকে কঁপা এসে হঠাৎ উমাপতিকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সে ভেবেছিল রাত যখন হয়ে গেছে তখন আর উমাপতি আসবেন না। তার বুকের ভিতর নিঃশ্বাস আটকে গেল যেন।

উমাপতি ততক্ষণে কামিনীর পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। দীপাকে দেখে একটু হেসে বললেন, 'চলো—' তারপর ড্রইং রুমে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে তোমার কোনরকম ট্রাবল হচ্ছে না তো ?'

দীপা আবছা গলায় বলল, 'না।'

ড্রইং রুমে এসে ওরা মুখোমুখি বসল। দীপা চোখ নামিয়ে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

উমাপতির শরীরে ইঞ্জেকশনটা কাজ করে যাচ্ছিল। রক্তের ভেতর এখন বেশ একটা চনচনে ভাব। তা ছাড়া কেমন যেন গরমও লাগছে। বললেন, 'কেউ কোনরকম ঝামেলা টামেলা করে নি তো ? ফ্ল্যাট বাড়ি বলে কথা।'

দীপা বলল, 'না।'

'মেইড সারভ্যাণ্টটা কী রকম কাজকর্ম করছে ?'

'ভালো।'

'ড্রেসিং টেবলের সেকেণ্ড ড্রয়ারে টাকাটা পেয়েছিলে ?'

'পেয়েছি।'

'আরো লাগবে ?'

'না।'

'লাগলে বোলো।'

এই সময় কামিনী এসে ড্রইং রুমে ঢুকল। আস্তে করে ডাকল 'বাবু—'

তার দিকে ঘুরে উমাপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলছ?'

একটু ইতস্তত করে কামিনী বলল, 'সবগুলোন ঘর খুঁজেও হুইস্কি না কী যেন বলে তার বোতল পেলাম না। ফেলাট-ভর্তি এত দামী দামী জিনিস কিন্তুন ঐ জিনিসটাই খালি এনে রাখতে ভুলে গেছেন গো বাবু।'

উমাপতি অবাক হয়ে বললেন, 'হুইস্কি দিয়ে কী হবে?'

কামিনী বলল, আপনার জন্যে—'

তার কথা শেষ হবার আগেই উমাপতি আরো অবাক হয়ে বললেন, 'আমার জন্যে? তার মানে?'

কামিনী উমাপতির চাইতেও কয়েক গুণ বেশি অবাক হয়ে গেল। এ জাতীয় লোকের কাছে আগেও সে কাজ করেছে। দেখেছে বাঁধা মেয়েমানুষের ফ্ল্যাটে আনন্দ করতে এলে প্রথমেই যেটা তারা চায় তা হলো হুইস্কি। হুইস্কি ছাড়া কোথাও সে ফূর্তি জমতে দ্যাখেনি। কিন্তু এই নতুন বাবুটার ধাঁচ অন্যরকম। চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে হুইস্কির নাম চোদ্দ পুরুষে এই প্রথম শুনল।

কামিনীর হতবাক মুখের দিকে তাকিয়ে উমাপতি এক পলক কী ভেবে বললেন, 'আমি ওসব খাই না।'

মেয়েমানুষের কাছে ফূর্তি করতে এসে হুইস্কি খায় না, এমন ভ্যাদভেদে লোক আগে কখনও দ্যাখেনি কামিনী। থ হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে সে চলে গেল। দু মিনিট বাদে একগাদা প্লেট নিয়ে আবার ফিরে এল কামিনী। প্লেটগুলোতে সন্দেশ, প্যাস্ট্রি, কেক, ক্রীম রোল—এই সব দিয়ে বোঝাই। খাবার দাবার আগে থেকেই ফ্রিজে রাখা ছিল। উমাপতির সামনে সেগুলো রাখতেই তিনি স্রেফ আঁতকে উঠলেন, 'এ সব কী? অ্যাঁ—'

কামিনী হকচকিয়ে গেল, 'আপনার জন্যে—'

'তুমি আমাকে মারতে চাও! এসব খেলে আমি ক'দিন বাঁচব?'

কামিনী বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

উমাপতি বললেন, 'বাড়ির বাইরে আমি চা ছাড়া কিছু খাই না। খাওয়াতে হলে একটু লেবু-চা করে আনো, খবরদার চিনি দেবে না।'

উমাপতির পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে দেখতে কামিনী কিচেনে চলে গেল।

উমাপতি এবার দীপার দিকে ফিরলেন, 'কাল যে এখানে এসেছ, তারপর ফ্ল্যাট থেকে আর বেরিয়েছ?'

'না।' দীপা মাথা নাড়ল, 'আপনি বেরুতে বারণ করে দিয়েছিলেন।'

'তা বটে। তবে দিনরাত বন্ধ ঘরে বসে থাকাটা কাজের কথা নয়। শরীর খারাপ হবে।'

কামিনী চা দিয়ে গেল। খেতে খেতে উমাপতি টের পেতে লাগলেন, গরমটা যেন বেশি লাগছে। ইঞ্জেকশনের ইনফ্লুয়েন্স কি বাড়ছে? জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা দীপা, তোমার গরম লাগছে?'

আজ এখানে আসার পর এখন পর্যন্ত উমাপতি যে সব কথা বলেছেন, মেয়েমানুষের কাছে আনন্দ করতে এসে সেরকম কেউ বলে না। দীপা বলল, 'না, তেমন গরম তো মনে হচ্ছে না।'

উমাপতি এরপর কী বলবেন, বুঝতে পারছিলেন না। রক্ষিতার কাছে এসে কী করতে হয়, কী বলতে হয় বা কী ধরনের আচরণ করতে হয়, এ সব সম্বন্ধে কোন ধারণা বা অভিজ্ঞতাই তাঁর নেই। তা ছাড়া দীপা তাঁর বড় মেয়ে শেফালীর চাইতেও ছোট। তার সম্পর্কে কোন খারাপ কথা ভাবতে ইচ্ছা করে না। যদিও ইঞ্জেকশনটা চুয়ান্ন বছরের ঠাণ্ডা রক্ত কিছুটা উষ্ণ করে তুলেছে, নাকের ডগা এবং কানের লতিতে উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে তবু মেয়ের বয়সী দীপার ব্যাপারে কোনরকম উত্তেজনা অনুভব করলেন না উমাপতি। যা-যা এলোমেলোভাবে মনে হয়েছে সবই বলে গেছেন তিনি। এখন দীপাকে বলার মতো আর নতুন কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। খুবই অস্বস্তি হতে লাগল তাঁর। তা ছাড়া একতরফা কতক্ষণ আর কথা বলা যায়। মেয়েটা বুকের কাছে

থুতনি ঠেকিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে আছে তো বসেই আছে। নিজের থেকে সে কথা বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে আধফোটা গলায় হুঁ-হাঁ করে যায় শুধু।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। উমাপতি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়ির জন্যে মন খারাপ লাগছে?' বলেই হঠাৎ খেয়াল হলো দীপাকে এরকম কথা বলা বোধহয় ঠিক হলো না। পরমেশ এখানে থাকলে নিশ্চয়ই রেগে যেত। কিন্তু মুখ থেকে যখন বেরিয়েই গেছে তা তো আর ফেরানো যাবে না।

দীপা উত্তর দিল না।

উমাপতির এভাবে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। এবার তিনি বললেন, 'এক কাজ কর, শাড়ি টাড়ি বদলে এসো—'

দীপা কোন প্রশ্ন করল না। করে লাভই বা কী? মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পোশাক পাল্টে এল। উমাপতি তার জন্য আগে থেকেই ওয়ার্ডরোব বোঝাই করে শাড়ি, সালোয়ার, পেটিকোট ইত্যাদি ইত্যাদি রেখে দিয়েছিলেন। তার ভেতর থেকে সব চাইতে সাদামাঠা একটা কাপড় পরে এসেছে দীপা।

উমাপতি তার দিকে তাকিয়ে খুঁতখুঁতে গলায় বললেন, 'কত বাহারী দামী দামী শাড়ি এনে রেখেছি। বেছে বেছে বুড়ীদের মতো এই বাজে সাদা শাড়িটা পরে এলে!'

দীপা উত্তর দিল না।

উমাপতি বলতে লাগলেন, 'তোমার বয়সের মেয়েরা কত রঙদার শাড়ি পরে। এই আমার মেয়ে শেফালীকেই ধর। তোমার চাইতে বয়েসে বড়, দুটো ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। টকটকে লাল শাড়ি ছাড়া গায়েই তোলে না।'

দীপা এবারও চুপ।

উমাপতি বললেন, 'যাক গে, পরেই যখন ফেলেছ কী আর করা যাবে। চলো একটু বেড়িয়ে আসি। সারাদিন ফ্ল্যাটে বসে আছ, বেড়িয়ে এলে মনটা ভালো লাগবে।'

দীপাকে নিয়ে একটু পর তিনি বেড়াতে বেরুলেন। কামিনী দরজা বন্ধ করে দিল।

রাস্তায় এসে এধার-ওধার দেখলেন উমাপতি। বলা যায় না, চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। সঙ্গে একটি যুবতীকে দেখলে হাজার রকমের কথা উঠবে। মেয়েটি কে, কোথায় যাওয়া হচ্ছে, তার সঙ্গে উমাপতির কী সম্পর্ক, ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষে দীপার কথা এ কান ও কান হয়ে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বাড়ি পর্যন্ত যাওয়াও আশ্চর্য কিছু না। দীপাকে নিয়ে ঝোঁকের মাথায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়াটা বোধহয় ঠিক হলো না। কিন্তু এখন ফেরাও যায় না। উমাপতি তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ধরে হড়বড় করে নিজে আগে উঠলেন, তারপর দীপাকে উঠতে বললেন। তার ওপর ট্যাক্সিওলাকে বললেন, 'আমরা একটু বেড়াব। আগে এসপ্ল্যানেডের দিকে চলুন—'

ট্যাক্সি সাদার্ন এ্যাভেনিউর মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে তেলের মতো গড়িয়ে ল্যান্সডাউন রোডের দিকে মোড় ঘুরল।

উমাপতি সীটের একধারে বসেছেন। আবেক দিকে জানালার ধার ঘেঁষে জড়সড় হয়ে বসেছে দীপা। মাঝখানে এক ফুট জায়গা একেবারে ফাঁকা, ঠিক এইভাবেই কাল' 'নু মুন ক্লাব' থেকে সাদার্ন এ্যাভেনিউতে এসেছিল তারা।

উমাপতি গলায় খাঁকারি দিয়ে ডাকলেন, 'দীপা—'

দীপা বাইরে তাকিয়ে ছিল। রাস্তার পাশের বাড়ি-ঘর-আলো কিংবা উল্টো দিক থেকে আসা গাড়ির স্রোত সট সট করে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই সব দৃশ্যাবলী সে যেন দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু একটা চিন্তাই তার মাথার ওপর এই মুহূর্তে চেপে বসে আছে। উমাপতি যেভাবে তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, মনে হচ্ছে আজ বাড়ি ফিরবেন না। বেড়াবার পর সাদার্ন এ্যাভেনিউর ফ্ল্যাটেই হয়ত থেকে যাবেন। উমাপতির গলা শুনে চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দীপা।

উমাপতি বললেন, 'জানো দীপা, আমার নিজের একটা গাড়ি আছে। পুরু করে ফোমের গদি দিয়েছি, বসতে খুব আরাম কিন্তু আমার দুঃখ তোমাকে সেই গাড়িটায় চড়াতে পারব না। আমার সঙ্গে বেরুলে তোমাকে ট্যাক্সি করেই ঘুরতে হবে।'

নিজের গাড়িতে চড়াতে না পারার জন্য কেন যে উমাপতির এত

খেদ, দীপা বুঝতে পারল না। এক পলক তাকিয়েই সে চোখ নামিয়ে নিল।

উমাপতি বললেন, 'আমার ড্রাইভারটা হচ্ছে পয়লা নম্বরের হারামজাদা। তোমাকে দেখলেই বাড়িতে গিয়ে আমার স্ত্রীকে রিপোর্ট করে দেবে। ও হচ্ছে আমার পরিবারের স্পাই। আর পরিবারটি এমন খাণ্ডার—' বলতে বলতে থমকে গেলেন। এ কথাটা বলাও বোধ হয় ঠিক হলো না। আজ বার বার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। উমাপতি ঘাড় ফিরিয়ে রাস্তা দেখতে লাগলেন।

তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে উমাপতি দীপার দিকে ফিরে বললেন, 'সকালবেলা ফোন করতে করতে লাইনটা কেটে দিতে হয়েছিল। তুমি কী একটা যেন বলছিলে; লাইন কাটার জন্যে শোনা হয় নি।'

দীপা বলতে চেয়েছিল বাড়িতে মায়ের পাগলামিটা বাড়তে দেখে এসেছে। ছোট ভাইবোনেরা তাকে সামলাতে পারবে কিনা, এ নিয়ে তার ভীষণ চিন্তা হচ্ছে। একবার সোদপুরে গিয়ে মাকে দেখে আসতে পারলে ভালো হতো। কথাটা তখন বলতে পারলে বলা হয়ে যেত। কিন্তু পরে সে ভেবে দেখেছে, তার সঙ্গে যা শর্ত আছে তাতে রবিবারের আগে এখান থেকে বেরুনো যাবে না। কাল এসে আজই যেতে চাইলে উমাপতি নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন। দীপা ঠিক করে ফেলল, বাড়ি যাবার কথা এখন বলবে না। বলল, 'তেমন কিছু না।'

ট্যাক্সিটা পার্ক স্ট্রীটে এসে গিয়েছিল। রাস্তার দু ধারে লাইন দিয়ে এখানে বড় বড় 'রেস্তোরাঁ' আর 'বার'। টাকা-পয়সা হবার পর পরমেশের সঙ্গে বার তিন-চারেক এখানকার রেস্তোরাঁ-টেস্তোরাঁয় ঢুকেছিলেন উমাপতি। বাইরে তিনি খান না কিন্তু জোর-জার করে পরমেশ তাঁকে কিছু ঝালমশলাওলা মুরগী না কী যেন খাইয়েছিলেন। খেয়ে বাড়ি ফিরে তিনি যান আর কি। পেটের যন্ত্রণা, আর সেই সঙ্গে ব্লাড প্রেসার কমাতে ঝাড়া সাতটা দিন বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল। তার ওপর ছিল প্রভাবতীর চিৎকার আর

গালাগাল। সাতটা দিন তাদের বাড়ির এক কিলোমিটারের মধ্যে কাক-চিল ঘেঁষতে পারেনি।

রেস্তোরাঁগুলো দেখতে দেখতে উমাপতি বললেন, 'তোমাকে তো হুট করে নিয়ে এলাম। বিকেলবেলা কিছু টিফিন-ফিপিন করেছিলে?'

দীপা বলল, 'চা খেয়েছি।'

'শুধু চা কেন? ফ্ল্যাটে এত খাবার রেখে দিয়েছি। মেইড-সারভ্যাণ্টটা তোমাকে দেয় নি? ওকে ধমকে দিতে হবে দেখছি।'

দীপা ব্যস্তভাবে বলল, 'দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বিকেলে চা ছাড়া আমি কিছু খাই না।'

উমাপতি বললেন, 'খাও না কেন?'

গলার স্বর নিচু করে দীপা বলল, 'বাড়ির অবস্থা ভালো না তো। টিফিন যোগাড় করা—' এই পর্যন্ত বলে চুপ করে গেল।

উমাপতি দীপার জন্য মনে মনে কষ্ট বোধ করলেন। পয়সার অভাবের জন্য ভালো করে খেতে পর্যন্ত পায় না। বললেন, এখন তো প্রবলেম নেই, এবার থেকে বিকেলে খাবে। বুঝেছ।

দীপা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। লোকটাকে দেখলে সে সিঁটিয়ে যায় ঠিকই কিন্তু এখন তাঁকে ভয় লাগছে না। তাঁর আচরণ, অন্তত এই মুহূর্তে, স্নেহময় বাবা বা কাকার মতো। দীপা টের পেল তার আড়ষ্টতা যেন কেটে যাচ্ছে।

একটা রেস্তোরাঁর কাছে আসতেই ট্যাক্সি থামিয়ে উমাপতি বললেন, 'চল, তোমাকে কিছু খাইয়ে আনি। এতক্ষণ খালি পেটে থাকা কোন কাজের কথা নয়, পিত্তি পড়বে।'

দীপা বলল, 'আমার খিদে পায়নি। ফ্ল্যাটে ফিরে তো খাবই।'

'তা তো খাবেই। এখানেও কিছু খেয়ে নেবে। ছেলেমানুষ; এখনই এত না খেয়ে থাকলে শরীর ভেঙে যাবে। আর শরীর একবার ভাঙলে জীবনটাই নষ্ট। নামো—

'কী আর করে!' ফুটপাতের ধারের জানালার কাছে বসে ছিল দীপা। দরজা খুলে সে আগে নেমে পড়ল, তারপর নামলেন উমাপতি। পকেট থেকে মোটা মাণি ব্যাগ বার করে ট্যাক্সিওলাকে

ভাড়া দিতে গিয়ে আচমকা তাঁর চোখে পড়ল, বড় জামাই সন্তোষ আর বড় মেয়ে শেফালী ঐ রেস্তোরাঁটাতেই ঢুকছে।

সঙ্গে সঙ্গে উমাপতির হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে গেল যেন। মনে হলো শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা স্রোত হুড় হুড় করে নেমে যাচ্ছে। এক ধাক্কায় দীপাকে সরিয়ে দিয়ে হুড়মুড় করে আবার তিনি ট্যাক্সিতে ঢুকে পড়তে পড়তে বললেন, 'উঠে পড়।'

হঠাৎ কী এমন হল, দীপা বুঝতে পারছিল না। সে হকচকিয়ে গিয়ে চোখের পলকে উঠে পড়ল। উমাপতি ট্যাক্সিওলাকে বললেন, 'গঙ্গার ধার—'

ট্যাক্সিওলা কম অবাক হয়নি। উমাপতির মাথাটা ঠিক আছে কিনা, সে সম্বন্ধে তার যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছিল। কয়েক সেকেণ্ড তাঁর আগাপাশতলা দেখে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে সে স্টার্ট দিল।

ট্যাক্সিটা পার্ক স্ট্রীট পেছনে ফেলে চৌরঙ্গী পেরিয়ে গুরু নানক সরণিতে ঢোকার পর উমাপতি দীপাকে বলল, 'এতদিন যখন বিকেলে টিফিন খাওনি তখন আজকের দিনটাও থাক। একেবারে কাল থেকে খেও।' বার বার মেয়ে-জামাইর মুখ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। ওরা কি তাঁকে আর দীপাকে দেখে ফেলেছে? দেখলে আজই তাঁর জীবনের শেষ রজনী; তাঁকে আর প্রাণে বেঁচে থাকতে হবে না। হতচ্ছাড়া দুটো রেস্তোরাঁয় খাবার আর দিনক্ষণ পেলে না? কলকাতা শহরে কয়েক হাজার রেস্তোরাঁ রয়েছে। পার্ক স্ট্রীটের এই রেস্তোরাঁটায় না এলে যেন খাওয়া হচ্ছিল না! ঐ সন্তোষ তো তাঁরই জামাই। তার হাঁড়ির কোন খবরটা উমাপতি না জানেন! সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের একটা অফিসে আপার ডিভিসন ক্লার্ক। এ্যালাউন্স ট্যালাউন্স মিলিয়ে মাইনে এখন সাতশো দশ টাকা সাতাশী পয়সা। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর লোন কেটে হাতে আসে ছশো কুড়ি বাইশ টাকার মতো। ঐ টাকায় চার সপ্তাহে চারটে রেশন তুলে তিরিশ দিন বাজার করে কতদূর ফুটানি করা যায়, উমাপতি সেটা ভালোই জানেন। পার্ক স্ট্রীটের দামী এয়ারকনডিশনড রেস্তোরাঁয় খেতে আসার নবাবীটা

কার পয়সায় হচ্ছে সেটা তাঁর চাইতে আর কে ভালো জানে! চালাও বাবা, শ্বশুরের পয়সায় পানসী চালিয়ে যাও।

যেতে যেতে আরো একটা ব্যাপার টের পাচ্ছিলেন উমাপতি। শরীরটা হঠাৎ ভীষণ খারাপ হতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ আগেও রক্তে একটা চনচনে ভাব ছিল, নাকের ডগা আর কান গরম হয়ে উঠেছিল। সেই তেজটা আর নেই। এখন বেশ শীত শীত লাগছে। হৃৎপিণ্ডের ওঠা-নামার গতি যেন কমতে শুরু করেছে, শরীরটা ক্রমশ ঝিমিয়ে আসছে। এটা কি মেয়ে-জামাইকে দেখার প্রতিক্রিয়া? উমাপতি ঠিক বুঝতে পারলেন না।

ট্যাক্সিটা গঙ্গার ধারে আউটরাম ঘাটের কাছে এসে পড়েছিল। যে দিকে তাকানো যাক, মার্কারি আলোর বান ডেকে গেছে যেন। দূরে গঙ্গায় এখন ভরা জোয়ার। সেখানে অনেকগুলো জাহাজ নোঙরে আটকে আছে। জাহাজগুলোর গায়ে অগুণতি লাল-নীল আলো। হু হু করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। সব মিলিয়ে জায়গাটা অলৌকিক মনে হচ্ছে।

উমাপতি বললেন, 'চল, জলের ধারে একটু বসি।'

দীপা আগে নামলো, তারপর উমাপতি। ট্যাক্সিওলাকে ভাড়া দিতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল খানিকটা দূরে তাঁর নতুন মডেলের ঝকঝকে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, তার গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে নিতাই, নিতাই উমাপতির ড্রাইভার। কয়েক গজ তফাতে গঙ্গার বাঁধানো ঢালু পাড়ে বটগাছের মতো ঝুরি নামিয়ে বসে আছে প্রভাবতী। ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে বসে আইসক্রীম খাচ্ছিল।

দেখামাত্র ব্লাড সুগার ব্লাড প্রেসার একসঙ্গে হুড় হুড় করে যেন নেমে গেল উমাপতির। বাঘের তাড়া খাওয়ার মতো এক লাফে ফের তিনি ট্যাক্সিতে ঢুকে পড়লেন। তারপর দীপাকে তুলে ড্রাইভারকে বললেন, 'চৌরঙ্গী চলুন—' বলতে বলতে দু ধারের জানালার কাঁচ তুলে দিলেন।

ড্রাইভার ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছিল না। আগের বারের মতো ঘাড় ফিরিয়ে উমাপতির আগাপাশতলা একবার দেখে নিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

উমাপতি মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানতে লাগলেন। নিতাই কিংবা প্রভাবতী বা ছেলেমেয়েরা তাঁকে দেখতে পেয়েছে কি? হে তিরুপতি, জয় বাবা তারকেশ্বর, হে মা রক্ষাকালী—ওরা যেন না দেখে থাকে। শরীরটা ভয়ানক অবসন্ন লাগছে। আচমকা যেন ডিসেম্বর-জানুয়ারির শীত পড়ে গেছে কলকাতায়। হাত-পা ভীষণ কন কন করছিল উমাপতির। তার মধ্যেই ভাবলেন, খুব সম্ভব ওরা দ্যাখে নি। প্রভাবতীর গুপ্তচর নিতাই দীপার সঙ্গে তাঁকে দেখলে নিশ্চয়ই চেঁচামেচি করে হৈ চৈ বাধিয়ে দিত। প্রভাবতীর কাছাকাছি থেকে তার ক্যারেকটারের কিছু কিছু ব্যাপার ওর ক্যারেকটারে ঢুকে গেছে। তার মধ্যে একটা হলো চিৎকার।

ট্যাক্সি চৌরঙ্গীতে এসে গিয়েছিল। ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এবার কোথায় যাব?'

উমাপতি সোজা হয়ে বসতেই দেখতে পেলেন সামনেই একটা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর। এতক্ষণ নিজের কথা ভেবে ভেবে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এবার দীপার কথা মনে পড়ল তাঁর। মেয়েটা তাঁর এ রকম আচরণের জন্য কী ভাবছে, কে জানে। খাওয়াবেন বলে খাওয়াতে পারলেন না, গঙ্গার ধারে বসবেন বলে বসতে পারলেন না। তার একটা ক্ষতিপূরণ করা দরকার বলে উমাপতির মনে হল। ভাবলেন ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরটা থেকে দীপাকে কিছু একটা কিনে উপহার দেবেন। কিন্তু ট্যাক্সি থামিয়ে নামতে গিয়ে আবার তক্ষুনি তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়তে হলো। তাঁর ভাগ্নে শঙ্কর আর ভাগ্নে-বউ সোমা দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে। উমাপতি-দমআটকানো গলায় ড্রাইভারকে বললেন, 'টেনে চালিয়ে দিন।'

'কোথায় যাব?' ড্রাইভার জানতে চাইল।

'আগে সামনের দিকে যান তো। পরে বলছি।'

খানিকটা যাবার পর উমাপতি বললেন, 'ভবানীপুরের দিকে চলুন—'

ড্রাইভার বলল, 'ঠিক কোথায় আপনারা যাবেন বলুন তো?' এ রকম সওয়ারী আগে আর কখনও পাইনি।'

উমাপতি বললেন, 'এই একটু এধারে ওধারে বেড়াব আর কি।'

'যেভাবে একেক জায়গায় নেমেই ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ছেন, তাতে আমার ভয়ই হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত নামতে পারবেন তো?'

'আরে বাপু নামবো নামবো। আপনার ট্যাক্সিতে রাত কাটাবো ভেবেছেন নাকি? আমার বাড়িঘর নেই? সাড়ে ন'টার ভেতর সেখানে আমাকে ফিরতে হয়।' বলতে বলতে বুক পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে একবার দেখে নিলেন উমাপতি। সবে সাড়ে আটটা। এখনো পুরো একটি ঘণ্টা সময় হাতে রয়েছে। তা ছাড়া প্রভাবতীকে গঙ্গার ধারে ঝুরি নামিয়ে বসে থাকতে দেখে এসেছেন। সে ফিরবার আগেই তিনি বাড়ি পেঁাছে যাবেন।

ড্রাইভার আর কিছু না বলে সামনে তাকালো। তার আর কি, যত মিটার চড়বে ততই লাভ।

উমাপতি আবার মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিয়েছিলেন। শরীর আরো খারাপ লাগছে। শীতটা আরো বাড়ছে। হৃৎপিণ্ডের গতি আরও মন্থর। তিনি বেশ টের পাচ্ছিলেন, ইঞ্জেকসনটা যে সাময়িক উত্তেজনা নিয়ে এসেছিল সেটা কেটে গেছে।

চোখ বুজে উমাপতি একটু আগের দৃশ্যগুলো পর পর ভাবতে চেষ্টা করছিলেন। প্রথমে সন্তোষ আর শেফালী; তারপর নিতাই, প্রভাবতী আর ছেলেমেয়েরা; তারও পরে শঙ্কর এবং সোমা। আজ পাঁজীতে গ্রহ-ট্রহরা কে কোথায় আছে, দেখা হয়নি। শুধু মনে আছে চাঁদটা আজও অশ্লেষা নক্ষত্রে রয়েছে। এই নক্ষত্রটা কোনদিন তাঁর খারাপ ছাড়া ভালো করে নি। কী কুক্ষণে আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন! খানিক বাদে বাড়ি ফেরার পর তাঁর কী হাল হবে, সেটাও তিনি জানেন না। যদি প্রাণে বেঁচে থাকেন ভবিষ্যতে অশ্লেষা নক্ষত্র মাথায় নিয়ে কোন কাজে বেরুবেন না।

ট্যাক্সিটা ভবানীপুরে একটা বড় ওষুধের দোকানের সামনে এসে গিয়েছিল। উমাপতির হঠাৎ ডাক্তার সেনের প্রেসক্রিপসনের কথা মনে পড়ল। কী একটা ট্যাবলেটের নাম লিখে দিয়েছেন। শরীরটা যেভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল তাতে রাত্রিতে ট্যাবলেটটা খেলে হয়ত ভালো লাগবে। ব্যস্তভাবে তিনি ট্যাক্সিওলাকে থামতে বললেন।

ফুটপাথের ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। উমাপতি নামতে গিয়েও নামলেন না। অশ্লেষা নক্ষত্র আজ যা খেলা দেখাচ্ছে তাতে এখানেও মাটি ফুঁড়ে একটি চেনা লোক যে বেরিয়ে আসবে না, তার কোন গ্যারাণ্টি নেই। কী ভেবে পকেট থেকে টাকা আর প্রেসক্রুপসন বার করে দীপাকে দিতে দিতে বললেন, 'আমি আর নামছি না। তুমি কষ্ট করে ওষুধটা কিনে নিয়ে এসো।'

দীপা ওষুধ কিনে আনার পর উমাপতি ট্যাক্সিওলাকে বললেন, 'সাদার্ণ এ্যাভেনিউ চলুন।' মনে মনে ভাবলেন, শরীর যেভাবে এবং যত দ্রুত খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাতে যত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা যায় ততই তাঁর পক্ষে মঙ্গল। রাস্তায় একটা স্ট্রোক-স্ট্রোক হয়ে গেলে আর দেখতে হবে না। প্রমোদ-ভ্রমণ হয়েছে।

সাদার্ণ এ্যাভেনিউতে এসে সেই বিশাল হাই-রাইজ বিল্ডিংটার সামনে দীপাকে নামিয়ে দিলেন উমাপতি। বললেন, 'আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। বাড়ি চলে যাচ্ছি। আমি কিন্তু আর নামলাম না।'

ভদ্রতার জন্যও উমাপতিকে নামার কথা বলা উচিত। দীপা কিছু বলল না। উমাপতির শরীর খারাপ জেনে তার ভালো লাগছিল না। কিন্তু তিনি যে রাত্তিরে এখানে থাকবেন না, এটাই তার পক্ষে একটা দারুণ সুখবর। আজকের রাতটার মতো দীপার দুর্ভাবনা কেটে গেল।

উমাপতি এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'লিফ্‌টে করে ওপরে যেতে পারবে তো?'

'পারব।'

'লিফট্ বক্সে ঢুকে ভালো করে দুটো দরজা বন্ধ করবে। একটুও যেন ফাঁক না থাকে। তারপর বারো নম্বর বোতামটা টিপবে। ওপরে উঠবে ভালো করে আবার দরজা বন্ধ করে দেবে।'

'আচ্ছা।'

'যদি না পারো তো বল। আমি তা হলে ওপরে দিয়ে আসি। একেবারে লজ্জা করবে না।'

দারুণ ব্যস্ত হয়ে দীপা বলল, 'না-না, আমি পারব।'

উমাপতি বললেন, 'আমি চলি। কবে আসব, তোমাকে ফোনে

জানিয়ে দেব।'

'আচ্ছা।'

উমাপতি চলে গেলেন। দীপা আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতর ঢুকে ওপরে উঠে তার ফ্ল্যাটের বেল টিপল।

কামিনী দরজা খুলে এধার ওধার দেখে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি একা দিদিমণি? বাবুটি কোথায়?'

দীপা ভেতরে যেতে যেতে বলল, 'বাড়ি চলে গেছেন। ওঁর শরীর খারাপ হয়েছে।'

দরজা বন্ধ করে কামিনী তার সঙ্গে সঙ্গে এল। দুজনেই দীপার বেডরুমে চলে এসেছিল। কামিনী বলল 'আপনার কপাল ভালো দিদিমণি।'

চোখ কুঁচকে দীপা জিজ্ঞেস করল, 'কিরকম?'

'ঐ ঢুসকো বুড়োটা মদ খায় না, চিনি খায় না, কেক-সন্দেশ খায় না অথচ মেয়েছেলে পোষার শখ। আপনাকে নিয়ে এক ঘণ্টা বেড়িয়েই শরীর খারাপ করে ফেলল। দেখবেন ঐ ঘাটের মড়া আপনার গায়ে একটা আঁচড় কাটতে পারবে না।'

দীপা উত্তর দিল না। তার মাথার ভেতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল।

কামিনী আবার বলল, 'ভালোই হয়েছে। ঐ জলে-পচা ভসভসে বুড়োটার ঘাড়ে পা রেখে পাশের ফেলাটের ছোকরা বাবুটিকে খেলিয়ে তুলে ফেলুন। আখেরে কাজ দেবে।'

দীপা এবারও চুপ করে রইল।

বারো

ওদিকে ট্যাক্সি থেকে নেমে বুকের ভেতর নিঃশ্বাস আটকে পা টিপে টিপে চোরের মতো নিজের বাড়িতে ঢুকলেন উমাপতি। বলা যায় না, প্রভাবতীরা এর ভেতর ফিরেও আসতে পারে।

বাড়িতে ঢুকেই অনেকখানি জায়গা ফাঁকা। সেখানে এসে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়ালেন উমাপতি। কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলেন, ভেতরে কোনরকম চেঁচামেচি হচ্ছে কিনা। প্রভাবতী যদি তার আর দীপার খবরটা পেয়ে থাকে, তাঁক কাছে পাক আর না-ই পাক গলা কাটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে একটা তুলকালাম কান্ড ঘটিয়ে ছাড়বে। কিন্তু না, আবহাওয়াটা উত্তেজনাহীন নিরুত্তাপ বলেই মনে হচ্ছে। খানিকটা সাহস করে উমাপতি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে চাকর নকুলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আস্তে করে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর মা বেড়িয়ে ফিরেছে ?'

নকুল বলল, 'না।'

'বড়দি আর বড় জামাইবাবু ?'

'না।'

বুকের ভেতরকার আটকানো বাতাসটা আস্তে আস্তে বার করে দিয়ে উমাপতি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। যাই হোক, বাড়িতে ঢুকেই তোপের মুখে পড়তে হয়নি। তার মানে এই নয়, ফাঁড়টা একেবারে কেটে গেছে। এখন ওপরে গিয়ে চুপচাপ ভবিতব্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। দু-এক ঘণ্টা বাদে কী ঘটতে পারে, ভাবা যাচ্ছে না।

তেতলায় এসে শার্ট-ট্রাউজার ছেড়ে লুঙ্গি পরলেন উমাপতি। তারপর খাটে উঠে চাদর মুড়ি দিয়ে নির্জীবের মতো পড়ে থাকলেন। শীতটা বাড়ছেই। মাথাটা ভীষণ ভারী লাগছে, ঘাড়ের কাছে পাথরের মতো কী যেন আটকে আছে।

একটু পর নকুল চিনি-ছাড়া চা দিয়ে গেল। রাত্রে বাড়ি ফিরে এক কাপ চা খাওয়া উমাপতির অনেক কালের অভ্যাস। শুয়েই তিনি ছোট ছোট চুমুকে খেতে লাগলেন। আধাআধি খাওয়া হয়েছে, এমন সময় পরমেশের টেলিফোন এল, 'কী ব্যাপার, তুমি বাড়ি এসে বসে আছ! কোন মানে হয়।'

উমাপতি বললেন, 'আমি বাড়ি এসেছি, তুমি কী করে জানলে ভাই ?'

'দীপা বললে।'

'তুমি সাদার্ণ এ্যাভেনিউতে ফোন করেছিলে নাকি ?'

'ইয়েস। তুমি কেমন ফুর্তির পানসি চালাচ্ছ, জানার চ্ছাই হয়েছিল। তারপর যে খবর পেলাম, চোখ কপালে উঠে গেল। ঐ রকম ভলাপচুয়াস প্রেটি ইয়াং গার্লকে ফেলে কেউ বাড়ি ফিরে যায়, এমন কথা আমার ফিফটি ফাইভ ইয়ার্সের লাইফে কারো কাছে শুনিনি।'

উমাপতি মুখ কাচুমাচু করে বিপন্ন গলায় বললেন, 'সাধে কি আর বাড়ি ফিরেছি! কী বিপদে পড়েছিলাম তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

'কী হয়েছিল?'

আদ্যোপান্ত সব বলে গেলেন উমাপতি।

পরমেশ বললেন, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। আনন্দ করার জন্যে অত সুন্দর ফ্ল্যাট কিনেছ। মেয়েটাকে নিয়ে বেরুতে গেলে কেন? এক্কেবারে হোপলেস।'

উমাপতি বললেন, 'আহা, মেয়েটা মনমরা হয়ে বসেছিল। তাই ভাবলাম—'

'তোমার অত ভাবাভাবির কী দরকার! বেড়াতে গিয়ে ঝামেলায় পড়েছিলে, ফিরে গিয়ে সাদার্ণ এ্যাভেনিউর ফ্ল্যাটেই থাকতে। এত টাকা খরচ করে বাড়িতে শুয়ে থাকার কী যে মানে, বুঝতে পারি না।'

'হয়ত থাকতাম। কিন্তু আমার শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গেল কিনা। তাই বাড়ি ফিরে আসতে হল।'

'শরীর খারাপ হবে কেন? ইঞ্জেকশন যা নিয়েছ তাতে তিন গুণ সারপ্লাস এনার্জি পাবার কথা।'

'প্রথম দিকে ভাই বেশ চনমনে হয়েই উঠেছিলাম কিন্তু পরে কী যে হলো, একেবারে বাড়ি এসে বিছানায় শুয়ে পড়েছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় ইঞ্জেকসনের এফেক্টটা খুবই টেম্পোরারি।'

'তা ঠিক। আমিও কয়েকবার নিয়েছি। এফেক্টটা কেটে গেলে শরীরটা খারাপ হয়ে যায়।'

'তুমিও নিয়েছ নাকি?'

'কী করব, আমারও তো মাঝে মাঝে যৌবন লাভ করে লাইফ

এনজয় করতে ইচ্ছে হয়। যাই হোক, রাত্তিরে ট্যাবলেটটা খেয়ে দেখ কী হয়—'

ঠিক সেই মুহূর্তে গোটা বাড়ির ভিত কাঁপিয়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যেতে লাগল। প্রভাবতীরা ফিরছে। স্ত্রীর পায়ের আওয়াজ তিনি চেনেন। তাড়াতাড়ি গলা নামিয়ে বললেন, 'এখন আর না ভাই, পরে কথা হবে। মনে হচ্ছে রণরঙ্গিণী ফিরে আসছে।' কট করে লাইন কেটে দিয়ে চোখ অল্প একটু ফাঁক করে মড়ার মতো পড়ে থাকলেন।

একটু পর প্রভাবতী তার কিরাট ইনফ্যাণ্ট্রি নিয়ে এ ঘরে ঢুকল। ঢুকেই খাটের দিকে তার চোখ পড়ল। এক পলক তাকিয়ে থেকে বলল, 'আজ এর ভেতর চলে এসেছ, দেখছি। মতিগতি রাতারাতি বদলে গেল নাকি?'

গলার স্বরটা বেশ নরমই মনে হল উমাপতির। তার মানে নিতাই বা প্রভাবতী তাঁকে গঙ্গার পাড়ে দেখতে পায় নি। পেলে দেখামাত্র তার ছাল ছাড়িয়ে ফেলত। তবু বলা যায় না, ভাবগতিক আরেকটু লক্ষ্য করা দরকার।

প্রভাবতী ডাকল, 'শুনছ?'

উমাপতি সাড়া দিলেন না। সাবধানের মার নেই। চোখ অল্প ফাঁক করে তাকিয়ে থাকলেন।

প্রভাবতী আবার বলল, 'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

এইমাত্র যেন ঘুমটা ভাঙলো, এরকম একটা ভাব করে উমাপতি গলার ভেতর একটু শব্দ করলেন। তারপর আস্তে আস্তে চোখ মেলে পাশ ফিরলেন। এখন পর্যন্ত লক্ষণগুলো কোনটাই খাবাপ না। বললেন, 'কী বলছ?'

'কখন ফিরেছ?'

'খানিকক্ষণ আগে।'

'ক্লাবের নেশা আজ এত তাড়াতাড়ি কেটে গেল?'

উমাপতি এখানে একজন প্রথম শ্রেণীর ডিপ্লোম্যাটের মতো চাল চাললেন, 'দেরি করে এলে তুমি রাগারাগি করো, অবশ্য আমার শরীর-স্বাস্থ্যের জন্যেই। তাই ভাবলাম আজ একটু আগে আগেই ফিরি। স্রেফ তোমার জন্যেই আজ এক ঘণ্টা আগে ফিরে এসেছি।

ভাবলাম তুমি খুশি হবে। তোমার কথা ভেবেই চলে এলাম।'
অভিজ্ঞতা মানুষকে অনেক কিছু শেখায়। উমাপতি জানেন ফ্ল্যাটারিতে কাজ হয়।

কথা বলতে বলতে প্রভাবতী এই ঘরেরই এক কোণে পোশাক বদলাতে শুরু করেছিল। গায়ে চর্বি বা মেদ বাড়লে মেয়েদের লজ্জা-টজ্জা অনেক কমে যায়। বাড়িতে পরার আটপৌরে একটা শাড়ি কোনরকমে কোমরে জড়িয়ে প্রভাবতী বলল, আমাকে খুশী করার জন্যে তোমার তো আর ঘুম হচ্ছে না। কথা শুনে মরে যাই।' বলে নাকের ভেতর একটা শব্দ করল। ইদানীং এটাই তার ভালবাসার প্রকাশ।

উমাপতি বুঝতে পারছিলেন, নিতাই বা প্রভাবতী তাঁকে দেখতে পায় নি। তিনি বেশ আরাম বোধ করতে লাগলেন। নিজেকে খুব ঝরঝরে লাগল।

প্রভাবতী আবার বলল, 'সন্ধ্যেবেলা তুমি ক্লাবে যাবার পর আমি একটা কাজ করেছি।'

উমাপতি জানতে চাইলেন, 'কী কাজ ?'

'সন্তোষকে দিয়ে ওর এক বন্ধুকে ফোন করিয়েছি। ওর বন্ধু রেলের অফিসার।'

সন্তোষের নাম শোনামাত্র শরীরটা আচমকা তিনগুণ খারাপ হয়ে গেল উমাপতির। মাথার ভেতর প্লেনের প্রপেলার চলার মতো কিছু একটা ঘুরতে লাগল যেন। নিতাই আর প্রভাবতীর ফাঁড়াটা কোনরকমে কেটেছে। কিন্তু এর পর সন্তোষ আছে, শেফালী আছে, শংকর আছে, সোমা আছে। ফাড়া কি তাঁর একটা ? ভরা অশ্লেষা নক্ষত্রে বেরিয়ে প্রাণটা তার গেল। উমাপতি কিছু না বলে নির্জীব চোখে তাকিয়ে রইলেন।

প্রভাবতী বলতে লাগলেন, 'সন্তোষের বন্ধু জানিয়েছে আসছে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিরুপতির টিকিট পাওয়া যাবে। সন্তোষকে বলে দিয়েছি কালই টিকিট কেটে ফেলতে। তুমি আমি চামেলি আর সোনা—এই চারজন যাব।' সোনা তাদের বড় ছেলে।

দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল প্রভাবতী। তার গলা সব সময় হারমোনিয়ামের শেষ সুরে বাঁধা থাকে। তবু সব যেন স্পষ্ট

শুনতে পাচ্ছিলেন না উমাপতি। আবছাভাবে তিনি বললেন, 'আচ্ছা।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে প্রভাবতীর কিরকম সন্দেহ হলো। উমাপতির গা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত একবার দেখে নিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার বল তো ?'

স্ত্রীর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে খুব সতর্ক হয়ে গেলেন উমাপতি। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্লাব থেকে ফিরে এসে শুয়ে আছ। শরীর খারাপ হয় নি তো ?'

প্রভাবতীর চোখে ধুলো দিয়ে কিছু করার বা হবার উপায় নেই। কিন্তু শরীর খারাপের কথা কবুল করলে ওবেলার মতো রাত্তিরেও তাঁকে বার্লি-টার্লি খেয়ে থাকতে হবে। দুবেলা স্রেফ বার্লির ওপর থাকতে হলে তিনি বাঁচবেন না। বললেন, 'না কিছু হয়নি তো।'

'তবে শুয়ে আছ কেন ?'

'তোমরা বাড়িতে কেউ ছিলে না। একা একা কী করব, তাই শুয়ে পড়েছিলাম।'

কথাটা মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্যই, প্রভাবতী আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

রাত্তিরে বরাদ্দ দু'খানা আলুনি রুটি, সবজি, মাছ এবং দু টুকরো মুরগি সেদ্ধ খাবার পর ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেসার, হার্ট ট্রাবল ইত্যাদির জন্য গুনে গুনে মোট আটটি ট্যাবলেট খেতে হল উমাপতিকে। দু গেলাস জল হাতে নিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে প্রভাবতীই ট্যাবলেটগুলো খাওয়ালো। রোজ সকাল-দুপুর এবং বিকেল, তিন বেলা কাছে দাঁড়িয়ে এইভাবে উমাপতিকে কয়েক গণ্ডা ট্যাবলেট গেলায় সে।

ওষুধ খাওয়া হলে উমাপতি শুয়ে পড়লেন। ঘরের লাইট নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে প্রভাবতী এক মিনিট পর এসে পাশে শুলো।

আজ সাড়ে আটটা পৌনে ন'টার সময় বাড়ি ফিরেই ডাক্তার সেনের সেই ট্যাবলেটটা বালিশের ওয়াড়ের ভেতর লুকিয়ে রেখে-ছিলেন উমাপতি। ভেবেছিলেন প্রভাবতী ঘুমিয়ে পড়লে এক সময় খাবেন।

কিন্তু প্রভাবতীর ঘুমোবার কোনরকম লক্ষণ দেখা গেল না। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সুর করে নিচু গলায় শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, লক্ষ্মীরপাঁচালী, ইত্যাদি ইত্যাদি আউড়ে গেল সে। তারপর ধরল 'সন্তোষী মা'র স্তব। ভক্তির ব্যাপারে এটা তার নতুন অ্যাডিসান। 'সন্তোষী মা'র ওপর একটা মাইথোলজিক্যাল ফিল্ম সুপারহিট হবার পর ইদানীং তার স্তবটা খুবই চালু হয়েছে। ভক্তির ব্যাপারে নতুন যে হুজুগই উঠুক না, প্রভাবতী তার ভেতর মাথা গলাবেই। তাকে বাদ দিয়ে হিন্দুধর্মের নতুন কোন ব্যাপার হবার উপায় নেই।

উমাপতি চোখ বুজে ঘাড় গুঁজে হাত-পা গুটিয়ে মটকা মেরে পড়ে রইলেন। এখন সুযোগের অপেক্ষা।

একেকজন দেব-দেবীর স্তব বা স্তোত্র শেষ হয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে দশ বার করে প্রণাম করে প্রভাবতী। এইভাবে রাত সাড়ে বারোটা বেজে গেল। তারপর আস্তে করে স্বামীকে ঠেলা দিয়ে বললেন, 'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

উমাপতি সাড়া দিলেন না। দিলেই আরো খানিকক্ষণ বকর-বকর করবে প্রভাবতী। তার মানে ডাক্তার সেনের ট্যাবলেট খাওয়াটা আরো খানিকক্ষণ পিছিয়ে যাবে।

প্রভাবতী আর কিছু বলল না। হাই তুলে তিন বার তুড়ি দিয়ে উমাপতির দিকে পাশ ফিরে শুলো।

উমাপতি আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলেন। তারপর নিঃশব্দে চোরের মতো বালিশের ওয়াড়ের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ট্যাবলেট বার করলেন। ট্যাবলেটটা বেশ বড় লম্বাটে। জল ছাড়া গেলা অসম্ভব, গলায় আটকে দম বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু উঠে জলের খোঁজ করতে গেলেও ধরা পড়ার সম্ভাবনা। উমাপতি ঠিক করলেন, চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন। ভাবামাত্র ট্যাবলেটটা মুখে পুরে ফেললেন।

কিডনি রক্ত, বা হার্টের মতো উমাপতির দাঁতগুলোও খুব খারাপ। আগেই আঠারোটা দাঁত তুলে ফেলতে হয়েছিল। সাকুল্যে এখন বারোখানা দাঁত অবশিষ্ট রয়েছে। রাত্রে শোবার সময়

আঠারোখানা বাঁধানো দাঁত তিনি একটা কাপে ভিজিয়ে রাখেন। সকালে সেগুলো ব্রাশ দিয়ে মেজে ধুয়ে আবার মাড়িতে লাগিয়ে নেন। বাকি যে তেরোখানা দাঁত রয়েছে তা দিয়ে চাপ দিতে গিয়ে উমাপতি টের পেলেন ট্যাবলেটটা লোহার গুলির মত শক্ত।

অনেকক্ষণ কসরতের পর ট্যাবলেটটা ভাঙতে পারলেন উমাপতি তারপর কড়মড় করে চিবোতে গিয়ে টের পেলেন, কুইনিনের তিন গুণ তেতো।

এদিকে কটর কটর করে চিবোনোর শব্দে কাঁচা ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল প্রভাবতীর। কিছুক্ষণ কান খাড়া করে শব্দটা শুনল সে। তারপর স্বামীকে আস্তে ঠেলা দিয়ে বলল, দাঁত কিড়মিড় করছ কেন? বুড়ো বয়েসে কিরমি (ক্রিমি) হল নাকি?

উমাপতি দাঁতে দাঁত চেপে দম আটকে পড়ে রইলেন।

প্রভাবতী ছাড়বার পাত্রী নয়। বলল, 'কি গো পেট গোলাচ্ছে?'

মুখের ভেতর তেতো বিষ ট্যাবলেট। জিভের অবস্থাটা যে কী, উমাপতিই জানেন। গিলতেও পারছেন না, আবার ফেলে দিতে পারছেন না।

প্রভাবতী এবার বলল, কথা বলছ না কেন?'

উমাপতি এবার 'উঁ' করে একটা শব্দ করলেন। ট্যাবলেট মুখে নিয়ে আর শুয়ে থাকা যাচ্ছে না। আচমকা বিছানা থেকে উঠে একরকম লাফ দিয়েই তিনি এ্যাটাচড্ বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন।

পেছন থেকে প্রভাবতী চেঁচাতে লাগল, 'কী হল তোমার, অ্যাঁ —কী হল?'

উমাপতি উত্তর দিলেন না। দেবার উপায়ও নেই। জিভের লালায় ট্যাবলেট ভিজে মুখ বোঝাই হয়ে আছে। বেসিনের কল থেকে আঁজলা আঁজলা জল খেয়ে ট্যাবলেটটা গিলে ফেললেন তিনি। কিন্তু মুখের তেতো ভাবটা কিছুতেই যাচ্ছে না। এক খিলি পান কিংবা সুপুরি-টুপুরি খেলে ভাল হতো। কিন্তু এত রাত্তিরে সে সব খুঁজতে গেলে আবার একটা বিপদ বাধবে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে উমাপতি আবার নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

প্রভাবতী একটু উদ্বিগ্ন স্বরেই এবার জিজ্ঞেস করল 'শরীর খারাপ হল নাকি ?'

উমাপতি খুব সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, 'না।'

'না তো, এতক্ষণ মুখে ছিপি আটকে আছো কেন ? জবাব দিতে পার না ?' প্রভাবতীর গলার স্বর আবার হারমোনিয়ামের শেষ স্কেলে চড়ে গেল, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার গলায় ফেনা উঠে গেল আর উনি ঘাপটি মেরে আছেন। মুখ থেকে একটা 'হ্যাঁ' কি 'না' বার করতে বড্ড পরিশ্রম—না ?'

উমাপতি উত্তর দিলেন না। কথা বললেই এই মাঝরাতে ঘণ্টা-খানিক চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে রাখবে প্রভাবতী। জিভের ডগা আর টাকরা থেকে আলজিভ পর্যন্ত পুরো জায়গাটায় জঘন্য তেতো স্বাদ নিয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকলেন উমাপতি।

আরো খানিকক্ষণ গজর গজর করে প্রভাবতী চুপ করে গেল।

মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে গেলেও কয়েক মিনিটের ভেতর উমাপতি টের পেলেন শরীর বেশ গরম হয়ে উঠেছে। আগের মিইয়ে পড়া অবসন্ন ভাবটা আর নেই। ডাক্তার সেন ইঞ্জেকসন দেবার পর যেমন হয়েছিল তেমনি রীতিমত চনমনে লাগছে। উমাপতি বেশ আরাম বোধ করতে লাগলেন। আর সেই অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরের দিন সকালবেলা যখন ঘুম ভাঙল তখন শরীরে এক ফোঁটা শক্তি নেই। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে, বুকের ভেতর প্যাল-পিটেসন বেড়ে গেছে। ঘাড়ের কাছটা ইঁটের মতো শক্ত, মনে হয় সেটা কোনদিন তিনি ঘোরাতে পারবেন না। হাত-পা যেন শরীর থেকে আলগা হয়ে গেছে, চোখ ভেতর দিকে টানছে। শুয়ে শুয়েই উমাপতি সামনের দিকে বাথরুমে শাওয়ার থেকে ঝর ঝর জল পড়ার শব্দ শুনতে লাগলেন। তার মানে প্রভাবতী স্নান করছে। সকাল-বেলা ঘণ্টাখানেক স্নান করে সে, তারপর ঘণ্টাদেড়েক পুজোর ঘরে থাকে। এই আড়াই ঘণ্টা মোটামুটি সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন উমাপতি। এই সময়টুকুই তাঁর যা শান্তি। এরপর প্রভাবতী এসে মেঝেতে বটের ঝুরি নামিয়ে বসবে এবং এখানে বসেই গলার

শির ছিঁড়ে চেঁচাতে চেঁচাতে সারা দিন ধরে তার রাজত্ব চালিয়ে যাবে। সে রাজত্বের আওতার মধ্যে উমাপতিও পড়েন।

যাই হোক, হাতের ভর দিয়ে কোন রকমে শরীরটা টেনে তুললেন উমাপতি। এই ঘরে আরেকটা অ্যাটাচড্ বাথ রয়েছে। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে তিনি সেদিকে এগিয়ে গেলেন। ঠিক-মতো পা ফেলতে পারছিলেন না। বাচ্চারা প্রথম হাঁটতে শেখার সময় যেভাবে টালমাটাল হয়ে হাঁটে ঠিক সেইভাবেই টলতে টলতে বাথরুমে ঢুকলেন উমাপতি।

এ বাড়ির সব বাথরুমেই লাইফ-সাইজ আয়না রয়েছে। কাঁচে নিজের চেহারা দেখে চমকে উঠলেন উমাপতি। গালের মাংস ঝুলে পড়েছে, ঘোলাটে চোখ দু ইঞ্চি গর্তে ঢুকে গেছে, তার তলায় পুরু কালি। মুখেও কালচে ছোপ। মাথার চুল হঠাৎ আরো সাদা হয়েছে।

উমাপতির মনে পড়ল, ইঞ্জেকসনটা নেবার পর যা যা হয়েছিল ট্যাবলেট খাবার পরও ঠিক তাই হয়েছে। অর্থাৎ সাময়িক এফেক্ট কেটে যাবার পর শরীর ভয়ানক খারাপ হয়ে গেছে। ডাক্তার সেনের ইঞ্জেকসন টিঞ্জেকসন নেবার আগে শরীরের হাল যা ছিল এখন তার তিন গুণ খারাপ।

কোনরকমে মুখটুখ ধুয়ে আবার বিছানায় এলেন উমাপতি। মাথা সোজা রেখে বসে থাকা যাচ্ছে না; তিনি শুয়েই পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ফোন বেজে উঠল। সেটা ধরতেই পরমেশের দারুণ উত্তেজিত স্বর ভেসে এল, 'তোমার জন্যে একটা গ্র্যাণ্ড খবর আছে।'

ঝিমানো গলায় উমাপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খবর?'

কাল রাত্তিরে তোমাকে সাদার্ন এ্যাভেনিউতে নামিয়ে বাড়িতে পা দিতেই ডাক্তার সেনের ফোন পেলাম। তিনি জানালেন একটা দুর্দান্ত হেলদি ইয়ং ছেলের কিডনি হঠাৎ পাওয়া গেছে। ছেলেটি দুদিনের জ্বরে মারা যাওয়ায় ওটা পাওয়া সম্ভব হল, পারফেক্ট কণ্ডিশানে আছে। বুঝতেই পারছ, পঁচিশ বছর বয়সের একটা ছেলের কিডনি। ডাক্তার সেনের ইচ্ছা তোমার অকেজো ড্যামেজড্ কিডনিটা বদলে দু-একদিনের মধ্যে ঐ কিডনিটা বসিয়ে দেবেন।

তারপর হার্ট কিংবা আই যেমন যেমন পাওয়া যাবে তেমন তেমন বসিয়ে দেওয়া হবে।'

উমাপতি আগের মতোই নির্জীব গলায় বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করে দাও ভাই। আমি আর এ সবে নেই।'

'কী হল তোমার?'

ইঞ্জেকসান এবং ট্যাবলেট কী হাল করে ছেড়েছে, উমাপতি বললেন।

শুনে পরমেশ বললেন, 'তোমাকে তো আগেই বলা হয়েছে এটা শর্ট-টাইম এ্যারেঞ্জমেণ্ট। আর এটাও ঠিক, টেম্পোরারি এফেক্ট কেটে গেলে শরীর একটু খারাপ হয়। এর জন্যে নার্ভাস হবার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর বল, কাল রাতের এক্সপীরিভিসন কী রকম হলো। ডিটেলসে বলবে, কিছু বাদ দেবে না।' বলে গলার ভেতর অশ্লীল শব্দ করে হাসলেন।

কাল রাত্তিরে সাদার্ন অ্যাভেনিউর ফ্ল্যাটে যাবার পর যা-যা ঘটেছে, সব বলে গেলেন উমাপতি। পরমেশের সঙ্গে কথা বলছিলেন ঠিকই, তবে তাঁর চোখ সর্বক্ষণ ছিল সামনের বাথরুমটার দিকে। শাওয়ারের শব্দ থেমে গেছে। প্রভাবতী বেরুবার আগেই পরমেশের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে ফেলা দরকার। পরমেশের সঙ্গে কথা বলার ওপর কোনরকম নিষেধাজ্ঞা নেই কিন্তু যে বিষয়ে আলোচনাটা হচ্ছে সেটা খুবই বিপজ্জনক। প্রভাবতীর কানে এর একটি অক্ষর ঢুকলে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

সবটা শুনে বিরক্তি আর আক্ষেপ মিশিয়ে পরমেশ বললেন, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। দেড় লাখ টাকার ফ্ল্যাট ছেড়ে কেউ মেয়েমানুষ নিয়ে রাস্তায় বেরোয়? যাদের চালচুলো নেই তারা আর কলেজের ছোকরা ছুকরিরা রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে প্রেম করে। তুমি একজন মাল্টি-মিলিওনেয়ার, একজন হাইলি রেসপেক্টবল সিটিজেন। তুমি কেন আনন্দ করার জন্যে রাস্তায় বেরুবে! তোমার পক্ষে এটা কিন্তু ডিগনিফাইড নয়। তা ছাড়া—'

'কী'

'কলকাতা শহরে তুমি বা আমি এ্যাবাউট থার্টি ইয়ার্স রয়েছি।

কয়েক হাজার লোক আমাদের চেনে। তুমি যে রাস্তায় যাবে সেখানেই একটা না একটা 'নোনফেস' পেয়ে যাবে। মেয়েটাকে নিয়ে সে জন্যে রাস্তায় বেরুনো খুবই বিপজ্জনক। কেননা তোমার ভাষায় তোমার একজন ছিন্নমস্তা স্ত্রী রয়েছেন--'

পরমেশের কথাগুলো যুক্তিসঙ্গত মনে হলো উমাপতির। দীপাকে নিয়ে কাল ওভাবে বেরুনোটা খুবই বোকামি হয়ে গেছে। হঠাৎ সন্তোষ আর শেফালীর কথা মনে পড়ে গেল। কাল কত রাত্রে ওরা ফিরেছে, তিনি জানেন না। এখানে এলে শেফালীরা দোতলায় থাকে। শংকর-সোমার ব্যাপারটাও অজানা রয়েছে। কাজেই বিপদটা কাঁধের ওপর ঝুলেই আছে। উমাপতি বললেন, 'মেয়েটা ভীষণ মনমরা হয়েছিল, তাই—'

পরমেশ বললেন, 'ওসব ভাবতে গেলে আনন্দটাই মাটি। পয়সা দিয়ে তুমি ওকে রেখেছ। তুমি তার রিটান আশা করবে নিশ্চয়ই। পয়সা বিলিয়ে দেবার জন্যে চ্যারিটেবল ফান্ড তো আর খুলে বসো নি।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।'

'যাক গে, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ডাক্তার সেনকে বলে দিচ্ছি, কামিং উইক কি তার পরের উইকে তুমি নতুন কিডনিটা নিচ্ছ। কবে তোমার পক্ষে সুটেবল হবে? সেই অনুযায়ী এ্যারেঞ্জমেণ্ট করে ফেলতে হবে তো।'

উমাপতির গলার ভেতর থেকে করুণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল, 'পারব না ভাই। লাইফ এনজয় করে আমার আর দরকার নেই। আমার কিডনি আমারই থাক। ডাক্তার সেনের ইঞ্জেকসন আর ট্যাবলেটও আমি আর চালাব না।'

একটু চুপ করে থেকে পরমেশ বললেন, 'তুমি ঘাবড়ে গেছ দেখছি। আমারই বোধহয় ভুল হয়েছে, হেকনি ক্যারেজে দশ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন লাগানো ঠিক হয়নি। তোমার ঐ লুজবুজে শরীরে এত কড়া ওষুধ না দিলেই ভালো হতো। ঠিক আছে, অপারেসনে যখন ভয়, তোমাকে একজন ভালো হোমিওপ্যাথের কাছে নিয়ে যাব।'

কাতর গলায় উমাপতি বললেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও না ভাই।

দীপাকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে বিদায় করে ফ্ল্যাটটা বেচে দেব ভাবছি।'

'ডিফিটিস্টের মতো কথা বলো না তো। সন্ধ্যেবেলা রেডি থেকো। আমি তোমাকে একজন হোমিওপ্যাথের কাছে নিয়ে যাবো।'

উমাপতি আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই পরমেশ লাইন কেটে দিলেন। অগত্যা ফোনটা ক্রেডেলে নামিয়ে রাখতে হলো।

একটু পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়ল প্রভাবতী। কিছুক্ষণের মধ্যে সুর করে তার স্তবপাঠের শব্দ ভেসে আসতে লাগল।

চোখের ওপর দুই হাত আঁড়াআড়ি রেখে শুয়ে থাকলেন উমাপতি। শরীরটা আরো কাহিল লাগছে। মাথার ভেতরটা কেমন যেন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তিনি আর বাঁচবেন না। হঠাৎ মনে পড়ল, কাল রাত্রে অশ্লেষা নক্ষত্র মাথায় করে দীপাকে নিয়ে যেমন বেরিয়েছিলেন তেমনি ডাক্তার সেনের চেম্বারেও গিয়েছিলেন। কী করে যে এত বড় ভুলগুলো তাঁর হয়ে গেল!

তেরো

সাদার্ণ অ্যাভেনিউর ফ্ল্যাটে আসার পর সাত-আট দিন কেটে গেছে।

সেদিন বেড়াতে বেরিয়ে উমাপতি সেই যে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ড করেছিলেন তারপর থেকে আর সাদার্ণ এ্যাভিনিউতে আসেন নি। তবে রোজই সকাল-সন্ধ্যে দু'বার ফোন করে দীপার খোঁজখবর নিয়েছেন, দরজায় ছিটকিনি আটকে সাবধানমতো তাকে থাকতে বলেছেন আর জানিয়েছেন তাঁর শরীরটা খুবই খারাপ হয়েছে, এক রকম শয্যাশায়ীই হয়ে পড়েছেন, সেজন্য আসতে পারবেন না।

এটা দীপার পক্ষে আশার অতিরিক্ত সুখবর। সে বেঁচে গেছে। সব জেনেশুনেই সাদার্ণ এ্যাভিনিউতে এসেছিল দীপা। সে জানতো একটা জঘন্য নরকে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছে কিন্তু উমাপতির অসুস্থতা তাকে একটু করে আশা দিচ্ছিল। দীপা প্রার্থনা

করছিল, উমাপতি শয্যাশায়ী হয়েই থাকুক। সেই সঙ্গে বাবার বয়সী এই লোকটার জন্য খানিকটা দুঃখও হচ্ছিল। ভদ্রলোক তাকে যে উদ্দেশ্যে সাদার্ণ অ্যাভিনিউতে এনে রেখেছেন কথায়-বার্তায় বা আচরণে তার ধার-কাছ দিয়েও যান নি। উমাপতির সঙ্গে তার বার দুই মোটে দেখা হয়েছে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও মনে হয়নি তিনি লম্পট বা চরিত্রহীন। বরং স্নেহময় বাবা বা কাকার মতোই মনে হয়েছে। সেই মানুষটা শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে একটু কষ্ট হয় বৈকি। আহা বুড়ো মানুষ!

এই সাত-আটদিনের ভেতর একটা রবিবার পড়েছিল। আগের দিন অর্থাৎ শনিবার উমাপতি যখন ফোন করেছিলেন তখনই দীপা জানিয়ে রেখেছিল রবিবার সে বাড়ি যাবে। উমাপতি বলেছিলেন, তাঁর অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই। রবিবার দীপার ছুটি, সেদিন সকালে উঠে যেখানে খুশি যেতে পারে সে। দীপা রবিবার বাড়ি গিয়ে মা এবং ভাইবোনদের দেখে এসেছে।

এই সাত-আট দিনে আরো একটা ব্যাপার ঘটেছে। রজতের সঙ্গে খানিকটা বন্ধুত্বই হয়ে গেছে দীপার। এ ব্যাপারে কামিনী খুবই সাহায্য করেছে।

সকালে ঘুম ভাঙার পর হাতে ব্রাশ নিয়ে রাস্তার দিকের ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায় দীপা। ততক্ষণে রজত ওদের ব্যালকনিতে চলে আসে। এক ঘণ্টা ধরে দাঁত মাজতে মাজতে দু'জনে এলোমেলো কথা বলে যায়। তারপর মুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্টটি যেই সারা হলো, রজত এই ফ্ল্যাটে চলে আসে। দুপুর পর্যন্ত গল্প-টল্প করে চলে যায়।

এই গল্পের ভেতর একদিন একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। উমাপতি দুম করে ফোন করে বসেছিলেন। অন্যমনস্কর মতো টেলিফোনটা তুলে রজত যেই বলেছে, 'হ্যালো—' অমনি ওধার থেকে উমাপতি বলেছিলেন, 'কে বলছেন আপনি? ওই ফ্ল্যাটে তো পুরুষ মানুষ থাকার কথা নয়। দীপা কোথায়?' রজত বলেছিল, 'আপনি কে বলছেন?' উমাপতি তাঁর নাম বলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ইজ ইট ফোর ওয়ান টু টু—' রজত ফোনের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল, 'এখানকার ফোন নাম্বার কত?'

দীপা দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে ছিল। সে বুঝতে পারছিল, উমাপতি ফোন করছেন। তিনি ছাড়া এখানে কেউ ফোন করে না। রজতের সঙ্গে কথা বলতে বলতে উমাপতি নিশ্চয়ই ক্ষেপে যাচ্ছেন। কেননা নিজের কেনা মেয়েমানুষেব ফ্ল্যাট থেকে ফোনে অন্য পুরুষের গলা শুনতে কে-ই বা পছন্দ করবে ?

রজত আবার বলেছিল, 'কী হলো, ফোন নাম্বারটা বললে না ?' পরস্পরকে এর মধ্যে তারা তুমি বলতে শুরু করেছিল।

উমাপতি রজতের কাছে যে নাম্বারটার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, শ্বাসরুদ্ধের মতো দীপা তাই বলেছে।

রজত আবার প্রশ্ন করেছে, 'উমাপতি সমাদ্দার কে ?'

হকচকিয়ে গিয়েছিল দীপা। পরক্ষণেই তার ভীত বিহ্বল ভাবটা কেটে গিয়েছিল। শ্বাস টানার মতো শব্দ করে সে বলেছিল, 'আগে ফোনটা রেখে দাও। পরে বলছি—'

রজত ফোন নামিয়ে রাখার পর দীপা বলেছিল, 'সেই বুড়ো ভদ্রলোক। সেদিন রাত্তিরে আমাকে দেখাশোনা করার জন্যে তোমাকে বলেছিলেন—'

'ও, আচ্ছা। তোমার কাকা না মামা হন তো ?

উমাপতিকে কেন দীপার কাকা বা মামা মনে হয়েছিল, রজতই জানে। দীপা আড়ষ্ট গলার কিছু একটা উত্তর দিয়েছিল, বোঝা যায়নি।

রজত আবার বগেছিল, 'উনি ফোন করেছেন, লাইনটা কাটতে বললে কেন ?'

দীপা উত্তর দেয় নি।

রজত একটু ভেবে মজা করে হেসেছিল, 'বুঝেছি, তোমার ঐ কাকা ছেলেদের সঙ্গে গল্প করা লাইক করেন না ?'

দীপা মুখ নামিয়ে আস্তে মাথা নেড়েছিল। সেই সময় আবার ফোন বেজে উঠেছিল। এবার রজত ফোনটা ছোঁবার আগেই দীপা ক্রেডেল থেকে তুলে কানে লাগাতেই ওধার থেকে উমাপতির গলা ভেসে এসেছিল, 'কে, দীপা ?'

দীপা আস্তে করে বলেছিল, 'হ্যাঁ—'তার বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছিল।

উমাপতি বলেছিলেন, 'একটু আগে তোমাকে ফোন করেছিলাম। পুরুষমানুষের গলা শুনতে পেলাম। ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছি। তোমার ফ্ল্যাটে পুরুষমানুষ এল কোত্থেকে?'

এক পলক ভেবে দীপা ঠিক করেছিল মিথ্যেই বলবে। জড়ানো স্বরে বলেছিল, 'এখানে তো পুরুষমানুষ নেই। আমি আর কামিনী—'

'তা হলে ঐ গলাটা কার?'

'বুঝতে পারছি না তো।'

'একটু আগে তোমাকে ফোন করলাম যে—'

ঢোক গিলে দীপা বলেছিল, 'এখানে কোন ফোন আসেনি।'

উমাপতি বলেছেন, 'তা হলে বোধ হয় রং নাম্বার হয়ে গিয়েছিল।' বলে নিজের অসুস্থতার কথা জানিয়েছিলেন।

তারপর থেকে রজতকে আর ফোন ধরতে দেয় না দীপা।

যাই হোক দুপুর পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে খেতে চলে যায় রজত। বিকেলে কাছাকাছি লেকের দিক থেকে তার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসে দীপা।

দীপা প্রথম প্রথম যেতে চাইত না। রজতই বলেছে, সারাদিন চুপচাপ ঘরে বসে থাকার মানে হয় না। এতদিন অবশ্য সে নিজে ফ্ল্যাট থেকে বেরুত না। কিন্তু দীপার সঙ্গে আলাপ হবার পর তার ইচ্ছা করে দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কোথাও বেরিয়ে আসে। কামিনীরও তাই ইচ্ছা। রজতের সঙ্গে দীপা বেরোক, দুজনের বন্ধুত্ব গাঢ় হোক, আন্তরিকভাবে সেটা চায় সে। দীপাকে তার ভীষণ ভালো লেগে গেছে।

দীপার অন্য দিক থেকে একটা দুশ্চিন্তা আছে। উমাপতি যে কোন সময় হুট করে চলে না এলেও ফোনটোন করতে পারেন। এসব কথা তো রজতকে বলা যায় না। তবে এ ব্যাপারে কামিনী তাকে খুবই সাহায্য করেছে। বলেছে, উমাপতি ফোন করলে বা এসে পড়লে সে সামলাবে। এর আগে যে বুড়ো গুজরাটীর মেয়েমানুষের কাছে কামিনী কাজ করত, সে-ও একটি ছোকরার সঙ্গে ডুবে ডুবে প্রেম করত। এ ব্যাপারে কামিনী তাকে প্রচুর সাহায্য করেছে।

তবু বেশি দূরে যায় না দীপারা। তার একটা আন্দাজ আছে, সন্ধ্যে সাতটা থেকে আটটার ভেতর উমাপতি একবার ফোন করেন। সাতটার আগেই রজতকে তাড়া দিয়ে সে ফিরে আসে।

এর মধ্যে রজতই তাদের ফ্ল্যাটে এসেছে বেশি। তবে দু-একবার জোরজার করে নিজেদের ফ্ল্যাটেও দীপাকে ধরে নিয়ে গেছে। একদিন মা আর দু-নম্বর বাবার সঙ্গে দীপার আলাপ করিয়ে দিয়েছে। মানুষ হিসেবে তাঁরা চমৎকার। তবে ওঁদের যে ব্যাপারটা দীপার সব চাইতে ভালো লেগেছে তা হলো—কোন কিছু সম্বন্ধেই তাঁদের অকারণ কৌতূহল নেই। হাসিঠাট্টা করেছেন, মজা করেছেন কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করেন নি—দীপার কে কে আছে? এখানে কার কাছে থাকে? ইত্যাদি ইত্যাদি—

এইভাবেই এখন দীপার সময় কেটে যাচ্ছে।

চোদ্দ

সেই যে উমাপতি ডাক্তার সেনের ইঞ্জেকসন নিয়েছিলেন আর লুকিয়ে ট্যাবলেট খেয়েছিলেন, শরীরের ওপর তার এফেক্ট ভীষণ খারাপ হয়েছে। ফল হয়েছে এই—পুরনো কিডনি, হার্ট আর চোখ বদলে নতুন কিডনি, নতুন হার্ট আর নতুন চোখ বসাবার প্রস্তাবটা তিনি নাকচ করে দিয়েছেন।

কাজেই একশো আটাশ টাকা ভিজিটের হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে উমাপতিকে নিয়ে গিয়েছিলেন পরমেশ।

ইন্টারন্যাশনাল ফেমওলা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সান্যাল আড়াই ঘণ্টা ধরে উমাপতি এবং তাঁর ওপরের দিকের তিন জেনারেসনের দুশো বাষট্টি জনের যাবতীয় অসুবিসুখের ইতিহাস টুকে নিতে নিতে বলেছিলেন, 'ওঁকে যৌবন দিতে পারব। তবে—'

পরমেশ উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তবে কী?'

'একটু সময় লাগবে।'

'কতটা সময়?'

'এখন একটা 'ডোজ' দেব। তার এফেক্ট হবে ছ মাস বাদে।'

'এত দিন?'

'যৌবনের মতো একটা ভ্যালুয়েবল জিনিস পেতে চলেছেন। একটু ধৈর্য তো ধরতেই হবে। মিস্টার সমাদ্দারের স্কিন লুজ হয়ে গেছে। হার্ট-কিড়নি-মাসল্-ব্লাড, এ সব কী অবস্থায় আছে আপনারা জানেন আচমকা যদি কড়া ডোজ চাপিয়ে দিই উনি সহ্য করতে পারবেন না। ড্যামেজড হার্টে, প্রেসারওলা ব্লাডে আর পুরনো কিডনিতে ডিজাস্টার ঘটে যাবে। সইয়ে সইয়ে সব করতে হবে।'

পরমেশ এবার বলেছিলেন, 'কোনভাবেই কি আরেকটু আগে আমার বন্ধুর ভিরিলিটি ফিরিয়ে আনা যায় না?

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'অত শর্ট কাট মেথোড আমার জানা নেই।'

পরমেশ আর কিছু বলেন নি। ভিজিট একশো আটাশ টাকা আর এক পুরিয়া ওষুধের দাম দু টাকা, মোট একশো তিরিশ টাকা গুনে দিয়ে উমাপতিকে সঙ্গে করে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। টাকাটা অবশ্য নিজের পকেট থেকে দ্যান নি পরমেশ, ওটা উমাপতিরই টাকা।

রাস্তায় এসে ওষুধের পুরিয়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন পরমেশ। বলেছিলেন, 'ইউথটা দরকার এখন। পোস্ট-ডেটেড চেক নিয়ে কী হবে বল। তার চাইতে এক কাজ করা যাক—'

উমাপতি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী কাজ?'

'কাল তোমাকে একজন ভালো কোবরেজের কাছে নিয়ে যাব। দুশো চৌষট্টি টাকা ভিজিট। ভদ্রলোকের ইন্টারন্যাশনাল ফেম। আগে রাজারাজড়ারা ওঁর পেসেন্ট ছিলেন। এখন বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, মিনিস্টার, পলিটিক্যাল লীডাররা ওঁর পেট্রন।' পরমেশ এক নিঃশ্বাসে, একটুও না থেমে বলে যেতে লাগলেন, 'বার্মা নেপাল মালয় সিঙ্গাপুর থেকেও অনেক বড় বড় লোক ওঁর কাছে ট্রিটমেন্টের জন্যে আসেন।'

এত বড় ঢালাও সার্টিফিকেট সত্ত্বেও খুব একটা উৎসাহিত হলেন না উমাপতি। বললেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও ভাই। শরীরের মড়েল চুয়ান্ন বছর আগেকার, একেবারে পুরনো ঝরঝরে হয়ে গেছে। ওষুধ দিয়ে ইঞ্জেকসান দিয়ে একে আর চাঙ্গা করা যাবে না।'

পরমেশ বলেছিলেন, 'ওটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও না। কথা দিচ্ছি, এক সপ্তাহের মধ্যে তোমাকে একেবারে নতুন মডেলের গাড়ির মতো ঝকঝকে করে দেব। ভাই, লাইফ এনজয় করবার কথা বলে অনেক টাকা খরচ করিয়ে দিয়েছি। শরীরের জন্যে লাইফটা যদি এনজয় করতে না পারো আমি ভীষণ অপরাধী হয়ে থাকব।'

'আরে না-না, তুমি অপরাধী হয়ে থাকবে কেন? আমি কিছু মনে করছি না।'

'তুমি মনে না করলেও নিজের কাছে কী কৈফিয়ত দেব।'

অগত্যা দু দিন বাদে কবিরাজের কাছে যাওয়া হলো। কবিরাজ নাগভূষণ মুখটি আয়ুর্বেদাচার্য, ভিষক্‌রত্ন যে ওষুধ আর হাজার গণ্ডা অনুপান দিলেন লুকিয়ে লুকিয়ে তাই খেয়ে শরীর আরো খারাপ হয়ে গেল। কেননা সেই সঙ্গে ডাক্তার চট্টরাজের ওষুধও চলছিল। এক সঙ্গে কবিরাজ এবং এ্যালোপাথিক—দু ধরনের ওষুধ এমন একটা কেমিক্যাল রি-অ্যাকসান ঘটিয়ে ছাড়ল যা উমাপতির নাইনটীন টোয়েণ্টি মডেলের পুরনো শরীর সহ্য করতে পারল না। কাজেই কবিরাজকেও বাতিল করে দেওয়া হলো।

কবিরাজ গেলেও পরমেশ কিন্তু এত সহজে ব্যাপারটা ছেড়ে দিলেন না। একটা যুবতী মেয়েকে তার অজস্র স্বাস্থ্যসুদ্ধ সাদার্ন এ্যাভেনিউর ফ্ল্যাটে এনে রাখা হয়েছে। আর তারই জন্য যৌবনের খোঁজে উমাপতিকে নিয়ে হেকিমি, ইউনানি—সবার কাছে ছুটতে লাগলেন পরমেশ। এ সবের নীট ফল হলো এই, শরীরটা একেবারে শেষ হয়ে গেল তাঁর।

এরই ফাঁকে ফাঁকে আরো একটা ব্যাপার চলছিল। পরমেশ সেই বিশ হাজার টাকা তো নিয়েছিলেনই, থোকে থোকে আরো টাকা আদায় করছিলেন।

এদিকে উমাপতির বড় জামাই সন্তোষ তিরুপতিতে তীর্থযাত্রার জন্য তাঁদের টিকিট কাটার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল।

এই ভাবে উমাপতির দিন কেটে যাচ্ছে।

পনেরো

আগেই বলা হয়েছে সেই যে সেদিন উমাপতি ট্যাক্সি থেকে দীপাকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তারপর আর সাদার্ন এ্যাভেনিউর ফ্ল্যাটে আসেন নি। তবে ফোনটা নিয়মিত করে যাচ্ছিলেন।

আজ সন্ধ্যায় দীপা এখন ফ্ল্যাটে একা রয়েছে। খানিকক্ষণ আগে রজতের সঙ্গে সে লেকের দিকে বেড়াতে গিয়েছিল। দীপা ফেরার পর কামিনী তার লাভারকে নিয়ে হাওয়া খেতে গেছে।

হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল। পনের মিনিটও হয় নি, কামিনী বেরিয়েছে। দু ঘণ্টার আগে সে কোনদিন ফেরে না। তবে এখন কে আসতে পারে? রজত কী? কিন্তু রজতের সঙ্গে ক মিনিট আগেই তো সে বেড়িয়ে ফিরেছে। উমাপতি ফোন করে জানিয়েছিলেন, আজও তিনি আসতে পারবেন না। তা হলে এটা নিশ্চিত, উমাপতিও আসেন নি।

কে হতে পারে? পায়ে পায়ে দরজার কাছে এসে কাচে চোখ রাখল দীপা। এইটুকুই বোঝা গেল, করিডরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দরজার খুব কাছে কাচ বসানো ফুটোটা আড়াল করে দাঁড়ানোর জন্য তার চোখমুখ কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

খানিকক্ষণ দ্বিধা করে দরজা খুলে দিল দীপা। বাইরে পরমেশ দাঁড়িয়ে আছেন। মুখটা অচেনা নয়। প্রথম দিন মন্মথর সঙ্গে ক্লাবে গিয়ে উমাপতির এই বন্ধুটিকে সে দেখেছিল।

দীপা কিছুটা অবাকই হয়ে গিয়েছিল। পরমেশকে সে এখানে কোনভাবেই আশা করে নি।

দীপা কিছু বলার আগে দারুণ মিষ্টি করে হাসলেন পরমেশ। বললেন, 'ভাবলাম, একলা থাকো। তোমাকে একবার দেখে যাই।' বলে দীপার পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। তাঁকে বাধা দেবার কোন সুযোগই পেল না দীপা।

পরমেশ আবার বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো—'

দীপা বিমূঢ়ের মতো পরমেশের সঙ্গে সঙ্গে ড্রইংরুমে এলো। পরমেশ একটা সোফায় বসে দীপাকে বসতে বললেন। দীপা প্রথমটা বসল না, সোফার গায়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল। ভদ্রলোক হঠাৎ এখানে কী উদ্দেশ্যে এলেন, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দীপার

বুকের ভেতর খিঁচ ব্যথার মতো একটা ভয় আটকে রইল যেন।

পরমেশ হেসে হেসে বললেন, 'কী হলো, বসো না।'

বারকয়েক বলার পর আড়ষ্ট হয়ে সোফার এক কোণে বসল দীপা।

পরমেশ এবার বললেন, 'তোমাকে সেই একদিন দেখেছি। আজ এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তোমার কথা মনে হলো, নেমে পড়লাম। ভাবলাম একটু গল্প টল্প করে যাই।'

দীপা উত্তর দিল না, মুখ নীচু করে বসে রইল।

পরমেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

দীপা মাথা নাড়লো—হচ্ছে না।

পরমেশ বললেন, 'এই যে ফ্ল্যাটটা দেখছ, যদিও উমাপতি তোমার জন্যে কিনেছে তবু আমিই নিজে পছন্দ করে দিয়েছি। আমার পছন্দটা কেমন?'

দীপা চুপ করে রইল।

পরমেশ উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার জন্যে উমাপতিকে দিয়ে একটা দামী টি ভি আর রেডিওগ্রাম কিনিয়েছি। একা একা মেইড সারভেন্ট নিয়ে থাকবে। সময় কাটাতে হবে তো। এ সব ভেবেই কেনানো।'

দীপা এবারও চুপ। বুকের ভেতর নিঃশ্বাস আটকে সে বসে রইল।

পরমেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'রেডিওগ্রামটা বাজাও তো?'

আধফোটা গলায় দীপা বলল, 'বাজাই।'

'টি ভি চালাও?'

'চালাই।'

'আর কী কী দরকার তোমার?'

'কিছু না।'

'যদি বলো তো উমাপতিকে দিয়ে একটা এয়ারকুলারের ব্যবস্থা করতে পারি। লজ্জা করো না।'

দীপা বলল, 'এখানে যথেষ্ট হাওয়া। এয়ারকুলারের দরকার নেই।'

একটু চুপ।

তারপর পরমেশ কি ভেবে গলার স্বরটা অনেক গভীরে নামিয়ে বললেন, 'উমাপতির খুব শরীর খারাপ, জানো তো?'

দীপা মাথা নাড়ল—জানে।

'সে ক'দিন এখানে এসেছে?'

'দু দিন।'

'রাত্তিরে থেকেছে?'

পরমেশের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে মুখ তুলল দীপা। দেখল, একদৃষ্টে তারই দিকে তাকিয়ে আছেন পরমেশ। লোভী বাঘের মতো তাঁর চোখদুটো চকচক করছে। গায়ে কাঁটা দিল দীপার। কাঁপা জড়ানো গলায় সে বলল, 'না।'

গলার ভেতর অদ্ভুত শব্দ করে আস্তে অস্তে এবার হাসছেন পরমেশ, 'কাণ্ডটা দেখ। এত বড় ফ্ল্যাট কিনে, সাজিয়ে, তোমাকে এনে রাখল। যে জন্যে এত আয়োজন তার কিছুই কাজে লাগলে না। উমাপতির জন্যে সত্যি দুঃখ হয়।' জিভের ডগায় চুক চুক করে আওয়াজ করলেন।

দীপা কাঠ হয়ে বসে রইল।

পরমেশ এবার বললেন, 'এতদিন এসেছ; নিশ্চয়ই ভীষণ লোনলি ফীল করছ।'

দীপা চুপ।

পরমেশ আবার বললেন, 'তোমাকে একটু আগে বলেছিলাম এখান দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ নেমে গেছি। কথাটা পুরোপুরি ঠিক না। ইচ্ছে করেই আমি নেমেছি। ভাবলাম উমাপতি তো আসতে পারছে না; এদিকে তুমি একা একা থেকে মনমরা হয়ে যাচ্ছ। আজ রাতটা এখানে থেকে তোমাকে একটু সঙ্গ দেব, ঠিক করেছি।'

দীপা চমকে উঠল। তার গলার ভেতর থেকে একটা ভীত চিৎকার বেরিয়ে এলো, 'না—'

পরমেশ বললেন, 'না কী। এত টাকা খরচ করে তোমাকে ডেকরেসনপীসের মতো সাজিয়ে রাখার জন্যে আনা হয়েছে বলে মনে করো নাকি? উমাপতি যতদিন না আসতে পারছে ততদিন তার হয়ে আমি প্রক্সি দেব।'

'না-না—'

'তোমার ইচ্ছামতো তো চলবে না। মেইড সারভেন্টটা কেথায়? একটু ভাজাভুজি করে দিক—' ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা হুইস্কির বোতল বার করে সামনের সেন্টার টেবলে রাখলেন পরমেশ।

আর সেই মুহূর্তে কী যেন হয়ে গেল দীপার। ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ন গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঁচাও বাঁচাও—'

পরমেশ ঠিক একা ভাবতে পারেন নি। ভয় পেয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'এই চেঁচাচ্ছ কেন? অ্যাঁ—'

দীপা থামে নি। সে সমানে চিৎকার করে যেতে লাগল।

একটু পর পাশের ফ্ল্যাট থেকে রজতের গলা ভেসে এলো। উদ্বিগ্নভাবে সে জিজ্ঞেস করছে, 'কী হয়েছে অ্যাঁ, কী হয়েছে? দাঁড়াও আসছি।' বলেই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এই ফ্ল্যাটে চলে এল। একবার দীপাকে, আরেক বার পরমেশকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?' পরমেশ যখন আসেন, দরজা বন্ধ করে আসতে ভুলে গিয়েছিল দীপা। তাই রজত এত তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছিল।

দীপা নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। দৌড়ে রজতের কাছে এসে আঙুল বাড়িয়ে ভীত গলায় বলল, 'ঐ লোকটা—,

ততক্ষণে রজত পরমেশের সামনে হুইস্কির বোতলটা দেখতে পেয়েছে। চোখের পলকে কিছু একটা বুঝে নিয়ে এক লাফে পরমেশের সামনে চলে এলো সে; বুকের জামাটা মুঠো করে ধরে এক টানে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল। বলল, 'সোয়াইন—' বলেই তার চোয়ালে দারুণ একখানা ঘুষি নামিয়ে দিল।

ঘাড়মুখ গুঁজে মেঝের কার্পেটের ওপর হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন পরমেশ। তারপর হাতের ভর দিয়ে যেই কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়েছেন, শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে তাঁব পেটে লাথির পর লাথি হাঁকালো রজত। আর সেই লাথিগুলো পরমেশকে করিডরে উড়িয়ে নিয়ে গেল যেন। দু হাতে রক্তাক্ত মুখ ঢেকে অন্ধের মতো টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে একসঙ্গে তিন-চারটে ধাপ টপকে হুড় হুড় করে নিচে নেমে গেলেন পরমেশ।

পরমেশকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এসে রজত দেখল, দুই মুখ হাঁটুর ভেতর গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে দীপা। তার পাশে বসে একটু দ্বিধা করে পিঠে হাত রাখল রজত। বলল, 'কী হয়েছে বল তো। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। লোকটা কে?'

দীপা ভাঙা ভাঙা কান্নাজড়ানো গলায় বলল, 'তোমাকে আমি সব বলব।' বলেই আবার শব্দ করে কাঁদতে লাগল।

রজত আর কিছু বলল না। কাছে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর কান্নাটা একটু থামলে নিজেদের পারিবারিক ইতিহাস থেকে শুরু করে কী অবস্থায় এখানে এসেছে, সব বলে গেল দীপা। কিছুই লুকালো না।

সব শোনার পর ক্ষিপ্ত রজত বলল, 'আই সী। সেই বুড়ো বাস্টার্ডটা তা হলে এই জন্যে তোমাকে এখানে এনে রেখেছে। ওকে, একবার আসতে দাও তাকে। লেট হিম কাম—'

দীপা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে চাও তুমি?'

'ওয়েট করো না; নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে।'

'এমন কিছু করো না যাতে আমার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। তা হলে সোদপুরে আমরা আর থাকতে পারব না।'

ষোল

হোমিওপ্যাথ, এ্যালোপ্যাথ, কবিরাজ, হেকিমি, ইউনানি—সব রকমের ওষুধ খেয়ে শরীরে আর কিছু ছিল না উমাপতির। শেষ পর্যন্ত হাল এমন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, বিছানা থেকে নামার শক্তিটুকু পর্যন্ত ছিল না। সুতরাং প্রাণে বাঁচার জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে বাইরের ওষুধ খাওয়া বন্ধ করলেন উমাপতি। আগের তুলনায় এতে ফল ভালই হয়েছে। দু'দিন ধরে অনেকটা সুস্থ আছেন।

আজ তাঁরা তিরুপতি যাবেন। বিকেলে ট্রেন। সকাল থেকে প্রভাবতী চিৎকার চেঁচামেচি করে চাকর দিয়ে হোল্ড-অল এবং হাজার রকমের লটবহর পোঁটলাপুঁটলি বাঁধা-ছাঁদা করছে। নিজেও হাত লাগিয়ে ট্রাংক-সুটকেস গোছাচ্ছে।

উমাপতি বিছানায় বসে বসে অন্যমনস্কর মতো সব দেখছিলেন। আর ভাবছিলেন সাদার্ন এ্যাভেনিউতে গিয়ে দীপাকে তিরুপতি যাবার কথাটা বলে আসবেন। দীপা যদি ক'দিন তাদের বাড়ি গিয়ে থাকতে চায় শুধু শুধু আটকে রাখবেন না। তাকে চলে যেতে দেবেন। কিন্তু সবার আগে সাদার্ন এ্যাভেনিউতে যাওয়াটা দরকার।

এখন বেরুতে গেলে প্রভাবতী কী মূর্তি ধারণ করবে, আগে থেকে বলা যায় না। এ ক'দিন ভোগার জন্য এক মিনিটও চিৎকার আর গালাগাল থামেনি। তার মুখ থেকে সেকেণ্ডে পাঁচশো হিসেবে প্রায় তিরিশ-চল্লিশ লাখ শব্দ বেরিয়েছে।

অনেকক্ষণ দোনামোনা করার পর শেষ পর্যন্ত উমাপতি বাইরে বেরুবার কথাটা মুখ ফুটে বলেই ফেললেন।

বাইরে বেড়াতে যাবে বলেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, মেজাজটা আজ খুব খারাপ ছিল না প্রভাবতীর। সুটকেস গোছাতে গোছাতে বাজখাঁই গলায় বলল, 'এখন তো বেরুতে চাইছ, ফিরবে কখন ?'

এটাই প্রভাবতীর স্বাভাবিক গলা। উমাপতির মনে হলো তাঁর রাশিচক্রে গ্রহতারার যোগাযোগ আজ ভালই। হয়ত তীর্থ করতে যাচ্ছে, সেই কারণে। তীর্থের সঙ্গে বেড়ানোটাও তো হবে। উমাপতি বললেন 'ঘণ্টাখানেকের ভেতর ফিরে আসব। অনেক দিন বিছানায় পড়ে আছি ; বাড়িতে আর ভাল লাগছে না।'

'আচ্ছা, যাও নিতাইকে নিয়ে গাড়ি করে ঘুরে এসো—'

প্রভাবতীর স্পাই নিতাইকে নিয়ে উমাপতি যাবেন সাদার্ন এ্যাভেনিউতে। নানা মতের টিট্রমেন্টে থেকে থেকে শরীরটা কাবু হয়ে গেলেও মাথাটা এখনও পরিষ্কার আছে। সেটা ভালই কাজ করছে। বললেন, 'গাড়ির দরকার নেই। আমি কাছেই একটু হাঁটাহাঁটি করব।'

প্রভাবতী আর কিছু বলল না।

উমাপতি বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা মোড়ের মাথায় এলেন। তারপর ঘাড় ফেরালেন। না, এখান থেকে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না। কিংবা বাড়ির কেউ তাকে দেখতে

পাবে না। তবু সাবধানের মার নেই। বেশ খানিকক্ষণ বাড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে একটা ট্যাক্সি ধরলেন উমাপতি। এত দূরে এসে ট্যাক্সি ধরার কারণটা এইরকম। প্রভাবতী তাঁকে বাড়ির গাড়ি নিয়ে বেরুতে বলেছিল। সেটা না নিয়ে ট্যাক্সি ধরতে দেখলে তার সন্দেহ হত। বাড়ি ফিরলে প্রভাবতী তার কী হাল করে ছাড়ত, সেটা একমাত্র তিনিই জানেন।

সাদার্ন এ্যাভেনিউর সেই হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ের সামনে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলেন উমাপতি। ভেতরে ঢুকে লিফ্‌টে করে থারটীনথ্ ফ্লোরে উঠে আসতে তিরিশ সেকেণ্ডও লাগল না।

লিফ্‌ট বক্স থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে এগিয়ে গেলে প্রথম ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দ্বিতীয় ফ্ল্যাটটা উমাপতির। যেতে যেতে দেখলেন প্রথম ফ্ল্যাটের দরজার সেদিনের সেই রুক্ষ চোয়াড়ে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ রজত। প্রথম দিন থেকেই রজত সম্পর্কে একটা ধারণা করে ফেলেছে উমাপতি। ধারণাটা ভাল না। চোখের কোণ দিয়ে তাকে এক পলক দেখে উমাপতি নিজের ফ্ল্যাটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

হঠাৎ রজত ডাকল, 'এ্যাই যে—'

উমাপতি দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর ভাল করে রজতের দিকে তাকাতেই চমকে উঠলেন। রজতের চোখের তারা দুটো যেন জ্বলছে ; দাঁতে দাঁত চাপা ; চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। উমাপতি কিছুটা ঘাবড়েই গেলেন যেন। কাঁপা গলায় বললেন, 'কী—কী ব্যাপার ?

রজত বলল, 'ব্যালকনিতে একটু আগে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম ট্যাক্সি করে নামলেন। জানি এখানেই আসবেন। তাই আপনাকে ধরার জন্যে ওয়েট করছি।'

উমাপতি ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, কিছু দরকার আছে ?'

রজত দৌড়ে এসে তার গলার কাছটা কলারসুদ্ধ মুঠো করে ধরল। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'হারামী, তোমার ফোর ফাদারের নাম আমি ভুলিয়ে ছেড়ে দেব।'

উমাপতি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'এ্যাই—

এ্যাই, গালাগাল দিচ্ছ কেন ভাই ?

'গালাগাল দিচ্ছি কেন ? রাসকেল, চামড়া যে এতক্ষণ তোমার তুলে ফেলিনি এটাই তোমার লাক।'

রজতের হাতের মুঠিটা গলার কাছে আরো জোরে চেপে বসছে। দম আটকে আসছিল উমাপতির। বললেন, 'খুব লাগছে। আমি বড় উইক। হার্টের ট্রাবল, কিডনিতে ড্যামেজ, ব্লাড প্রেসার। এইরকম চেপে ধরলে মরে যাব ভাই। ছেড়ে দাও—'

রজত গলার স্বর তিন পর্দা চাড়িয়ে দিল, 'ছেড়ে দেব ! তোমার দাঁত একটি একটি করে তুলে নিচ্ছি আগে, তারপর ছাড়ছি—'

'ভাই যেরকম ভয় দেখাচ্ছ, আমার কিন্তু স্ট্রোক হয়ে যাবে—'

সাঁড়াশির মতো উমাপতির গলাটা চেপে ধরে রজত চেঁচালো, 'শালা খচ্চর, দাঁড়াও তোমার ব্যবস্থা করছি—'

উমাপতির ভয়ে ঘামতে শুরু করেছিলেন। বললেন, 'আমি কী করেছি, আমার অপরাধটা কী হয়েছে তাই তো বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছ না বুড়ো ভাম। এই বয়সে ফুর্তি করার জন্যে একটা মেয়ে এনে এখানে তুলেছ ! চল শালা, তোমাকে পুলিশে হ্যাণ্ড ওভার করে দিচ্ছি—'

উমাপতির মনে হলো এইমাত্র তাঁর একটা করোনারি এ্যাটাক হয়ে গেল। ব্লাড প্রেসার হুড় হুড় করে নেমে যেতে লাগল ; ব্লাড সুগার ধাঁ ধাঁ করে চড়তে লাগল। চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন তিনি। সেই অবস্থাতেই ঘাড় ফিরিয়ে এধার-ওধার দেখে নিলেন ; কেউ আবার রজতের কথা শুনে ফেলল কিনা।

কী কুক্ষণেই না তিনি আজ বেরিয়েছেন। আসার সময় পাঁজী দেখার কথা মনে ছিল মা। কিছুদিন ধরে বার বরে এই ভুলটা হয়ে যাচ্ছে তাঁর। পাঁজীটা কনসাল্ট করলে তিনি বুঝতে পারতেন এই সময়টা ভাল না। তা হলে আজ আর এখানে আসতেন না। বাড়ি থেকে ফোন করার সুযোগ আজ পাওয়া যেত না। টুক করে এক ফাঁকে বাইরে বেরিয়ে টেলিফোনে দীপাকে জানিয়ে দিলেই হতো। উমাপতি কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন 'মাইরি, মা কালীর দিব্যি, আমার কোন খারাপ মতলব ছিল না। আমার প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড খারাপ, কিডনি-হার্ট-ব্লাড—সব জায়গায় গণ্ডগোল, আমার কি

ফুর্তি করা পোষায়। তা ছাড়া দীপাকে আমি খারাপ চোখে দেখি না।'

চিৎকার-টিৎকার শুনে দীপা আর কামিনী ওধারের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছিল। বাইরের করিডরে এরকম একটা দৃশ্য দেখে তারা যতটা অবাক হয়েছে ঠিক ততটাই ভয় পেয়ে গেছে।

উমাপতি দীপাকে দেখতে পেয়েছিলেন। ডুকরে ওঠার মতো করে তিনি বললেন, 'ঐ যে দীপা রয়েছে, ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখ—কোনদিন ওর কাছে বদমাইশি করতে এসেছি কিনা।' দীপাকে বলল' 'তুমিই বল না—'

দীপা রজতকে চোখের ইশারায় উমাপতির গলা ছেড়ে দিতে বলল। রজত ছেড়ে দিয়ে দু হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে বলল, 'তা হলে দীপাকে এনে এখানে রেখেছেন কেন? পারপাসটা কী?

'আমার ফ্ল্যাটে এসো। সব বলছি—'

রজত ওদের ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে উমাপতির সঙ্গে তাঁদের ফ্ল্যাটে চলে এলো। তারপর ড্রইংরুমে তিনজনে—অর্থাৎ উমাপতি, দীপা আর রজত গিয়ে বসল। কামিনী দৌড়ে কিচেনে চা করতে গেল; কিন্তু তার কান দুটো কুকুরের মতো খাড়া হয়ে এদিকেই থেকে গেল।

উমাপতি প্রায় দম-আটকানো মানুষের মতো কেন, কী কারণে দীপাকে এখানে এনেছেন, সব খুঁটিনাটি বলে গেলেন। একটু থেমে জোরে শ্বাস টানতে টানতে আবার শুরু করলেন, 'এবার বুঝতে পারছ, আমার কোন খারাপ মতলব নেই। শুধু পরমেশদের পাল্লায় পড়ে এই ঝামেলায় পড়তে হয়েছে।

রজত বলল, 'কথা শুনে মনে হচ্ছে একেবারে ব্রহ্মচারী। সত্যি করে বলুন তো, বদমাইশি করার ইচ্ছে আপনার ছিল না?'

উমাপতি তক্ষুনি ঘাড় কাত করলেন, 'ছিল। ফরবিডন ফ্রুট তো। কে আর চাখতে না চায়! কিন্তু দীপাকে দেখে আর ওর কথা শুনে খুব সিমপ্যাথি হয়েছে। ওকে নিজের মেয়ের মতো দেখতে শুরু করেছি।'

'কায়ে পড়লে নিজের বৌকে লোকের মা মনে হয়। যাক গে, আজ এসেছিলেন কী করতে?'

'আমি কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। তাই দীপাকে বলতে

এসেছিলাম। ইচ্ছে হলে ও সোদপুরে ওদের বাড়ি গিয়ে এ ক'দিন থাকতে পারে।'

'তা না হয় থাকল কিন্তু এখানে এনে দীপার কত বড় একটা ক্ষতি করে দিয়েছেন, কখনও ভেবে দেখেছেন?'

উমাপতি চমকে উঠে বললেন, 'কিন্তু বিলিভ মী, আমি ওকে টাচ পর্যন্ত করিনি।'

রজত বলল, 'আমি না হয় বিশ্বাস করলাম; অন্য লোকে করবে না। আমাদের সোসাইটিকে তো জানেন।'

উমাপতির হঠাৎ একটা কথা মনে হলো। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বাইফোকাল লেন্সের চশমাটা ব্যর করে নাকের ডগায় ঝুলিয়ে রজতকে দেখতে দেখতে বললেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী?'

'আবার গলা টিপে ধরবে না তো? তখন ধরেছিলে, চামড়ায় নখ ঢুকে জ্বালা জ্বালা করছে।'

উমাপতির চোখমুখের চেহারা দেখে ভীষণ মজা লাগল রজতের। ঠোঁট কামড়ে বলল, 'ধরব না, বলুন—'

উমাপতি বললেন, 'দীপার ব্যাপারে তোমার এত ইন্টারেস্ট কেন?'

ঠিক এরকম একটা প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিল না রজত। সে হকচকিয়ে গেল, 'মানে—মানে দীপা আমার বন্ধু।'

উমাপতি বললেন, 'কদ্দিন তোমাদের আলাপ?'

'আপনি ওকে এখানে নিয়ে আসার পর আলাপ হয়েছে।'

এই সময় কামিনী চা নিয়ে এলো। উমাপতি তাকে বললেন, 'আমার কিন্তু চিনিওলা চা চলবে না।'

কামিনী বলল, 'জানি। চিনি ছাড়াই নিয়ে এসেছি। এই কাপটা আপনার।'

চা দিয়ে কামিনী চলে গেল।

উমাপতি আবার রজতের দিকে ফিরলেন। বললেন, 'তা হলে বন্ধুত্ব খুব বেশিদিনের না।'

রজত মাথা নাড়ল, 'না—'

একটু চুপ করে থেকে উমাপতি বললেন, 'দীপা মেয়েটা বড় ভাল কিন্তু ভীষণ দুঃখী। তুমি ওর ফ্যামিলির কথা শুনেছ?'

'শুনেছি।'

'ফ্যামিলিকে বাঁচাবার জন্যে সে এই খারাপ রাস্তায় এসে পড়েছে তুমি একটা ইয়ং ম্যান। দীপার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। ইচ্ছা করলে তুমি কিন্তু ওকে বাঁচাতে পারো।'

রজত বলল, 'কী করে?'

উমাপতি ঠোঁটের ডগায় আধফোটা হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'একটু ভেবে দেখ।'

'বুঝতে পারছি না।'

'পারবে পারবে। শোন, আমি আজ সন্ধ্যেবেলায় তিরুপতিতে তীর্থ করতে যাচ্ছি। ভাবাভাবিটা এর মধ্যে কমপ্লীট করে রাখবে।' বলতে বলতে একটু থেমে উমাপতি পরক্ষণেই আবার শুরু করলেন, 'দীপার সম্বন্ধে যদি তেমন করে ভাবো, এই ফ্ল্যাটটা আমি ওকে দিয়ে দেব।'

রজত উত্তর না দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে একবার দীপার দিকে তাকালো। দেখল এক দৃষ্টে দীপা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই মুখ নামিয়ে নিল সে।

উমাপতি বুক পকেট থেকে পকেট-ওয়াচ বার করে একপলক দেখেই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন, 'সর্বনাশ, এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। আর দেরি করলে স্ত্রীর হাতে প্রাণটা আমার যাবে। তা হলে ঐ কথাই রইল। এক মাস পরে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সব কিছু ফাইনাল করে রাখবে। আমি এসে যেন সানাইওলাদের ডাকতে পারি।' বলতে বলতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরে লিফটে করে নামতে নামতে উমাপতির মনে হতে লাগল অনেক দিন পর তাঁর শরীরটা খুব হাল্কা হয়ে গেছে; মাথার ওপর দশ কুইণ্টাল ওজনের দুশ্চিন্তাটা আর নেই। ছানিওলা চোখ, অকেজো কিডনি, রক্তচাপ, ব্লাড সুগার—এই সব নিয়ে জীবনকে কি আর এনজয় করা যায়! দীপা আর রজতের বন্ধুত্ব হয়েছে। এর চাইতে সুখবর আর কী হতে পারে!……

উমাপতি ভাবতে লাগলেন, বাঁচা গেল! আসলে যে বয়সের যা। তিরুপতির টিকিট কেটে ঠিক কাজটি করেছে প্রভাবতী।

—:—